পদচিহ্ন

ইন্দ্রনাথ বর্মণ

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

পদচিহ্ন

ইন্দ্র লাল চাক্‌মা

সূচীপত্র

১। আমি তারেই খুঁজি বারে বার ৭

২। আমার দেখা রাঙ্গামাটি একদিন ১২

৩। মারিশ্যা একটি জায়গার নাম ১৪

৪। চাক্‌মাদের বিঝু বাজার ১৮

৫। ফিরে এল বিঝু ২১

৬। শিকার ২৬

৭। জুমিয়ার সংসার ২৯

৮। মুননুয়াম পাড়ায় একদিন ৩৩

৯। ডরোথি ৩৭

১০। পক্ষীমুড়া ধোপানী ঘাট ৪৩

১১। হবিগঞ্জের দিনগুলি ৪৭

১২। লালন মাস্টার ৫৪

১৩। তুইচুই হতে বেটলিং ৫৭

১৪। নুনছড়ি পুকুর ৬১

১৫। খাগড়াছড়ির আকর্ষণ আলুটিলার সুড়ঙ্গ ৬৩

১৬। থানচীর পথে ৬৬

ভূমিকা

'পাছে লোকে কিছু বলে' এ আশঙ্কায় কিছু লিখব কি লিখব না মনস্থির করতেই আমার জীবনের অনেক বেলা গড়িয়ে গেল। শেষে লেখা ভাল হোক বা মন্দ হোক কিছু লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষা অফিসার হিসাবে বিভিন্ন পদে চাকুরীকালীন সময়ে সুযোগ হয়েছে পার্বত্য এলাকার কিছু কিছু স্থান দেখার। পদব্রজে আমি ভ্রমণ করেছি উত্তরে সাজেক ভ্যালীর বেটলিং পাড়া হতে দক্ষিণে রুমা ও থানচী। পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে এখানকার উপজাতীয়দের সহজ সরল জীবন যাপনের সাথে। আমার আরও সুযোগ হয়েছে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় চাকুরী করার সুবাদে অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির দানশীলতা ও মহত্বের সাথে পরিচয় হওয়ার। এ অভিজ্ঞতায় আমার লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে।

ইতোপূর্বে আমি চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত দৈনিক পূর্ব কোণে 'নূনছড়ি পুকুর', 'তুইচুই হতে বেটলিং' এবং 'লালন মাস্টার' নামে ৩টি লেখা পাঠিয়েছিলাম। সৌভাগ্য ক্রমে এ ৩টি লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য সাময়িকীতে। এ গুলোও এ পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত করলাম। পত্রিকায় ছাপানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় দৈনিক পূর্ব কোণের সম্পাদক সাহেবকে। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় বাবু রামেশ্বর শীল, অবসর প্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয়কে যিনি কষ্ট করে আমার এ লেখাগুলোর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন।

চাকুরীরত অবস্থায় অবসর সময়ে আমি কিছু কিছু লিখলাম বিভিন্ন বিষয়ের উপর। আমার এ লেখার সাথে ঘটনার কোন ধারাবাহিকতা নেই। মূল বিষয়গুলোর সাথে বাস্তবতারও কোন কোন ক্ষেত্রে মিল নেই। তবে ঘটনাগুলো এ রূপেই ঘটে থাকে ইহার উপর ভিত্তি করে আমার এ লেখার অবতারণা।

পদচিহ্ন

আমার এ লেখাগুলো কি নামে সাজাবো তা'ও ভেবে কুল পাইনা। শেষে এ চিন্তাই আমার মনে উদিত হল যে, যেহেতু যে দৃশ্যগুলো আমি দেখেছি এবং যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আমার জীবন চলার পথে সেহেতু এ বইয়ের শিরোনাম 'পদচিহ্ন' নাম দিলেই বোধ হয় সার্থক হবে। এ ভেবে প্রথম খন্ডে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস বইখানি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

চাক্‌মা সংস্কৃতির প্রভাবিত আমার এ লেখায় ভাষার দৌর্বল্য প্রকাশ পাবে। অনেক ক্ষেত্রে বানান অশুদ্ধ ও রস উপলব্ধির ক্ষেত্রে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হবে। এ জন্য সহৃদয় পাঠকগণের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

পাঠক সমাজ আমার এ লেখাগুলো পড়ে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ পেলেও আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব।

২৪শে অক্টোবর ২০০২ইং

ইন্দ্র লাল চাক্‌মা
জীবতলী, বাঘাইছড়ি
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

পদচিহ্ন

আমি তারেই খুঁজি বারে বার

সে দিন ছিল ২১শে মার্চ ১৯৮০ ইংরেজী।

বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা শহরে যখন পৌঁছি তখন বিকাল ৩.০০ টা। সিলেট জেলার পশ্চিম প্রান্তে নদী-নালা, হাওর বেষ্টিত ভাটি এলাকার শহর সুনামগঞ্জ। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী এলাকার সু-উচ্চ স্থানে বসবাসে অভ্যস্ত লোক হিসাবে সুনামগঞ্জ এসে মনে হল যে, আমি যেন একটি ভাসমান জাহাজের নীচ তলায় বসে আছি।

সুনামগঞ্জ শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সুরমা নদী বিশাল আকার। লঞ্চঘাটে অপেক্ষমান লঞ্চগুলো জামালগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, বিশ্বম্বরপুর, তাহেরপুর, ধর্মপাশা, ভৈরব বাজার, আজমিরিগঞ্জ ও ছাতক যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বড় বড় মহাজনী নৌকাগুলি নানা রকমের পসরা নিয়ে পাল তুলে হাওয়ায় উড়ছে। ছোট ছোট নৌকাগুলি নানা চিত্র, বিচিত্র সাজে সাজানো। মাঝিরা বিভিন্ন স্থানের যাত্রীদের ডাকছে ভাড়া যাওয়ার জন্য।

সুনামগঞ্জের বিখ্যাত মরমী গায়ক হাছন রাজার নাম কে না শুনেছেন? সুনামগঞ্জের মাছ, গলদা চিংড়ী, গাওয়া ঘি, বুনো হাঁসের মাংস কে না খেয়েছেন? কে না মুগ্ধ হয়েছেন এই জেলার উদারমনা মানুষদের আতিথেয়তায়?

এখানকার পুরানো অফিসগৃহ, বাসা-বাড়ী ইত্যাদি সবই বৃটিশ আমলের। এঁদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, সবেই যেন কেমন বৃটিশ বৃটিশ ভাব। পীর, বনেদী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক হিসাবে পরিচয় দিতে তাঁরা গর্ববোধ করেন। কোন কোন গর্বিত পিতা চায়ের দোকানে, অফিসের বারান্দায় ও বটতলায় বসে নিজের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে কথা বলতে ভালবাসেন। যেমন তাঁদের ছেলে-মেয়েরা লন্ডন, আমেরিকা ও আরব রাষ্ট্র সমূহে চাকুরী করেন, হাজার হাজার ডলার তাঁরা উপার্জন করেন, বৃদ্ধ পিতা-মাতা গ্রামে বাস করেন, তাঁরা কোথাও যেতে চান না ইত্যাদি। তাঁদের গল্প শুনে ছাত্র জীবনে পঠিত অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্রে" বর্ণিত কিচ্ছাখানী বাজারের গল্পটি মনে পড়ে।

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, হাওর, মেঘপুঞ্জের মত আসামের চেরাপুঞ্জী পাহাড় শ্রেণী নবাগত যে কারোর দৃষ্টি কাড়ে। সুনামগঞ্জ শহরের রাস্তা-ঘাট বেশ জমজমাট। রিক্সার বাহুল্য থাকলেও অন্যান্য যানবাহনের সংখ্যা তেমন নেই। তাই এখানে পরিবেশ দূষণ নেই।

নতুন যাত্রাপথে আমার রাস্তা-ঘাট সবই অচেনা। এক রিক্সাওয়ালা বাস স্ট্যান্ড থেকে লোকের ভিড় ঠেলে ঠেলে আমাকে নিয়ে এলেন জগন্নাথ মন্দিরের পাশে জগন্নাথ হোটেলে। এই হোটেলের পরিবেশ হিন্দুয়ানী বলা চলে। অপ্রশস্ত হোটেলের কক্ষে আশ্রয় নিয়ে বিশ্রামান্তে শহরের বিভিন্ন অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ালাম শহরটি দেখার জন্য। জেটিঘাটে গিয়ে কোন্ লঞ্চ. কখন ছাড়ে ইত্যাদির খবরাখবর নিলাম। সুনামগঞ্জের ভাটি এলাকায় জামালগঞ্জ থানার সাচনা বাজার। বাজারটি এ এলাকায় খুবই প্রাচীন। সুনামগঞ্জ হতে ইহার দূরত্ব বিশ মাইল। লঞ্চে যেতে সময় লাগে তিন ঘন্টা।

বিধাতার নাম স্মরণ করে পরদিন বিকাল ১.০০ ঘটিকার সময় ধর্মপাশাগামী লঞ্চে উঠলাম। অচেনা জায়গা। তাই বুক দুরু দুরু কাঁপছে অজানা আশংকায়। আবহমান বাংলার একই রূপ। নদীতে শত শত পালতোলা নৌকা। নদীর বালুচরে ছেলে-মেয়েরা খেলছে। গৃহবধুরা নদী হতে পানি নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ নদীর পাড়ে এক প্রকার কালো মাটি স্তুপীকৃত করে রাখছে। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, বর্ষায় প্রবল স্রোত দু'কূল ছাপিয়ে যায়। তখন কোনটা নদী কোনটা হাওর চেনা দায় হয়ে পড়ে। দূরে দূরে মরূদ্যানের মতো হাওরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনবসতিগুলি এ সময় ভাসমান শেওলার মতো মনে হয়।

যাঁরা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে বসবাস করেন তাঁরা দেখতে পান যে নদীগুলিতে জোয়ার ভাটা খেলে, সাম্পান মাঝি গায় ভাটিয়ালী গান। কিন্তু এখানকার নদী-নালায় জোয়ার ভাটা খেলে না, মাঝি গায়না ভাটিয়ালী গান। তবে এখানে হাওর এলাকায় দেখা যায় সাজানো নৌকায় বরযাত্রী। পূজার সময় গ্রামে গ্রামে মেয়েরা নেচে গায় মঙ্গল গীত। এখানকার নৌকাগুলি নানা রঙে রঞ্জিত, নানান চিত্রে চিত্রিত। কোন কোনটি হাঁসের মতো, মাছের মতো দেখতে। পাল তোলা অবস্থায় নৌকাগুলি চলে।

তরতর করে লঞ্চ ভাটির দিকে এগিয়ে চলল। নদীর উভয় পাড়ে যাত্রীরা উঠা-নামা করে। মরমী কবি হাছন রাজার ঘাট পেরিয়ে ক্রমে রামপুর, নুরপুর, উজানদৌলতপুর, লম্বাবাঁক হয়ে সাচনা বাজারে পৌছলাম। সাচনা বাজার জামালগঞ্জের নদী বন্দর। এখান হতেও লঞ্চ বিভিন্ন বাজারে যাতায়াত করে।

সাচনা বাজারের পশ্চিমে সুরমা নদীর অপর পাড়ে জামালগঞ্জ থানা সদর। এ এলাকা ভাটি এলাকা হওয়ায় বর্ষাকালে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়ার

একমাত্র মাধ্যম হল লঞ্চ ও নৌকা। ফেরী নৌকায় আমি যখন জামালগঞ্জ পাড়ি দেই তখন বিকাল ৪.০০টা বাজে।

এ সময় জামালগঞ্জ থানা সদরের নদীর পাড়ে অনেকে বিকাল ভ্রমণ করছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাঁরা আমার আগমন অপেক্ষায় ছিলেন আমাকে গ্রহণ করার নিমিত্তে তাঁরা এগিয়ে এলেন। শিক্ষকদের মধ্যে আব্দুল হান্নান, আব্দুর রহিম, জামালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শফিকুল ইসলাম, দানবেন্দ্র চক্রবর্তী, চন্দ্রক্রান্ত চৌধুরী ও সমরেন্দ্র দাস সবাই আমাকে সদর অভ্যর্থনা জানালেন।

পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমরা থানা শিক্ষা অফিসের দিকে যাত্রা করলাম। শিক্ষা অফিসের সহকারী বাবু সত্য রঞ্জন দাস ও বিবেকানন্দ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

শিক্ষকদের সাথে আনুষ্ঠানিকতার পর আমরা থানা প্রশাসক, সার্কেল অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করি। সার্কেল অফিসার জনাব মতিউর রহমান একজন অমায়িক লোক। তিনি আমাকে চা পানে আপ্যায়িত করে নানা ভাবে উৎসাহিত করলেন এবং অচেনা অজানা জায়গায় বসবাসের সাহস যোগালেন। সেখান হতে বিদায় নিয়ে আমরা জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব গোলাম কিবরিয়ার সাথে দেখা করলাম। তিনি এই এলাকার একজন গণ্যমান্য, শ্রদ্ধেয় ও আদর্শবান শিক্ষক। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করায় এই এলাকার সবার নিকট তিনি শিক্ষাগুরু রূপে সুপরিচিত।

জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়টি সুরমা নদীর পাড়ে একটি মনোরম স্থানে অবস্থিত। নদীর পাড়ে পাকা রাস্তা। বিদ্যালয়ের চারিদিকে শিয়াল কাঁটা ঝোপে ঘেরা। সামনে প্রশস্ত মাঠ, প্রধান শিক্ষকের বাসা এবং একই প্রাঙ্গনে জামালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। নদীর পাড়ে খোলা আকাশ ও প্রশস্ত মাঠ থাকায় সকাল-বিকাল সকল শ্রেণীর লোকের ভীড় জমে এই স্থানে।

কথায় কথায় অনেক কিছু আলাপ হল প্রধান শিক্ষকের সাথে। এখানকার ঐতিহ্য লোকজনের পছন্দ, অপছন্দ, শিক্ষায় পশ্চাৎপদতা প্রাথমিক শিক্ষকগণের কর্মনিপুণতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হল।

এই এলাকায় ভাড়ায় থাকার জন্য বাসা-বাড়ীর দারুণ অভাব। বর্ষাকলে সকল ঘরে পানি ছুঁই ছুঁই করে। এখানকার গ্রাম্য এলাকায় বসবাসে অভ্যস্ত নহি বিধায় শিক্ষকগণ যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা সবাই আপাততঃ জামালগঞ্জ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কমনরুমে আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন। একটা চৌকির ব্যবস্থা হল। দিনে বিছনা গুটিয়ে রাখা হবে এক পাশে। বিদ্যালয়ের সন্নিকটে স্যানিটারী ল্যাট্রিন। গোসলের জন্য ছিল নদী।

শিক্ষকগণ সেদিন আমার থাকার ব্যবস্থা করে একে একে সবাই বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা সমাগত। পাশের মসজিদ হতে আজানের পবিত্র ডাক শোনা গেল। ঘরে ঘরে খুপী বাতি ও হারিকেন জ্বলে উঠল। পল্লী বিদ্যুৎ এখনো পৌঁছেনি। জেনারেটরের সাহায্যে যে বাতি জ্বলে তাহা শুধু সীমিত অফিস, বাসা ও ক্লাব ঘরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাত্রি নেমে এল। নদী হতে ঠান্ডা বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবছি। বান্দরবানের সেই রুমা থানা। খরস্রোতা সাঙ্গু নদী। সাঙ্গু নদীর বালুচর। বিরল জনবসতি। বর্ষায় কখনও যন্ত্রচালিত নৌকা চলে। অবশিষ্ট সময় ভাড়া নৌকায় চলাচল করতে হয়। ভাড়া নৌকায় গাদাগাদি হয়ে চারজন যাওয়া যায়। মাঝি নদীর এপাড় ঐপাড় লগী দিয়ে নৌকা ঠেলিয়ে চলে। পথে এক রাত্রি নৌকায় কাটাতে হয়। মাঝে কত ঝরণা পাড়া গ্রাম চোখে পড়ে। কোন কোন পাড়া জনবসতিহীন ও পরিত্যক্ত। পথে ঘোড়াও মারমা পাড়া, পলী পাড়া, মুরুঙ্গমুখ পাড়া ইত্যাদি পাড়া পড়ে। নদীর দু'পাড় খাঁড়া ও জঙ্গলময়। এ জঙ্গলে উপজাতীয়রা জুম চাষ করে। কোন কোন সময়ে নদীর পাড়ে নিভৃত স্থানে হরিণ ও বন মোরগ চরতে দেখা যায়।

রুমা থানার শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে অশ্রুসজলনেত্রে সপরিবারে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রুমা পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের যেন বিদায় দিল। নীচে কলকল রবে প্রবাহমান সাংগু নদী। ভাটির দিকে নৌকা বেশ দ্রুত গতিতে চলে। পরিবারের মধ্যে আমার ছোট মেয়ে এবং আমার স্নেহময়ী মা সঙ্গে ছিলেন। চৈত্র মাসের কড়া রোদ, তখন নদীর পাড়ে নানা ধরনের রবী ফসল উঠানোর সময়। এক বালুচরে মার্মা কৃষক তরমুজের ক্ষেত করেছেন। আমরা তার খামারবাড়ীতে বিশ্রাম নিলাম ও তরমুজ কিনে খেলাম। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা বান্দরবানের উজানী পাড়ায় এসে পৌঁছলাম। বাবু রসময় খীসা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা পৌঁছার সাথে সাথে তিনি আমাদেরকে যাবতীয় কায়িক ও বাচনিক ভাবে সাহায্য করলেন। অচেনা অজানা স্থানে এরূপ সাহায্য পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি আমাদের জন্য তাঁরই বাসার পাশে একটি

বাসা ভাড়া করে রেখেছিলেন। আমরা নতুন বাসায় উঠলাম এবং তাঁরই বাসায় সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়া করলাম।

মারমা উপজাতীয় এ এলাকার পরিবেশ ভালো নহে। আশপাশের দু-এক পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও অধিকাংশ পরিবারের প্রধান পেশা হলো শ্রমজীবিকা। তাছাড়া ভাষাগত দুর্বোধ্যতা ও পানি সরবরাহের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অভাব আছে। এতদসত্ত্বেও বান্দরবান শহরের পূর্ব পাশে বাসাটি অবস্থিত হওয়ায় এবং বাড়ীর চারিদিকে সুন্দর ঘেরা বেড়া থাকায় মোটামুটি এখানকার পরিবেশ সুন্দর। আমার মা বৃদ্ধা ও অসুস্থ। তাই নানা আকাশ পাতাল ভাবনায় সময়ক্ষেপণ করছিলাম।

বাহিরে তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। নদীতে ব্যাঙ ডাকছে কর কর শব্দে একটানা। উত্তর আকাশে একফালি মেঘ, বৃষ্টি হবে বুঝি। নতুন কর্মক্ষেত্রে আমার কি অবস্থা হবে, পাহাড়ী লোক হিসাবে এই এলাকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব কিনা এইরূপ ভাবনার মধ্যে যখন আমার সময় অতিবাহিত হচ্ছে ঠিক সেই সময় একটি হারিকেন এগিয়ে আসতে দেখলাম। হারিকেনবাহী লোকটি হলেন জনাব শফিকুল ইসলাম। জামালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর পিছনে দু'জন ছোট বাচ্চা। তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বললেন, "আপনার জন্য খানা নিয়ে এসেছি, স্যার"। এই বলে তিনি টিফিন ক্যারিয়ারটি আমার টেবিলের পাশে রাখলেন। তাঁর পিছনে দু'ছেলের পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, "এরা আমার ভাগনা, তাদের বাপের নাম মোঃ হাসেম, হোমিও ডাক্তার এবং মায়ের নাম শামীম আরা। আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষিকা। আপনার কথা শুনে তিনি আপনার জন্য খানা পাঠিয়েছেন। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করুন।"

বিদেশ বিভুঁই জায়গায় এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। বিশেষ করে মুসলিম রমণীরা তো খুবই রক্ষণশীলা এবং পর্দানশীলা বলে জানতাম! কাজেই তাঁদের কাছ থেকে এমন আতিথেয়তা পাওয়ার আশা আমার ছিল কল্পনারও বাইরে। আমার চিন্তান্বিত মুখ দেখে শফিকুল ইসলাম বললেন, "কোন চিন্তা করবেন না স্যার, আমাদের সিলেটিরা সাধারণতঃ অতিথি পরায়ন হন"।

মুহূর্তে আমার যত চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে গেল। মানবাত্মার ডাক আমি শুনতে পেলাম সকল প্রাণে। নিজের অসহায়ত্ব ভুলে আপনত্ব খুঁজে পেলাম তাঁদের মাঝে। ভাই ভগ্নি ও পরমাত্মীয় রূপে গ্রহণ করলাম সবাইকে। ধর্ম,

গোত্র, জাতি ভেদাভেদ সব একাকার হয়ে গেল তখন আমার মানবাত্মার মহা সমুদ্রে।

আমার খাবার এসেছে! পাঠিয়েছেন এক মুসলিম ভগিনী! আমার এখন চিন্তা কিসের? এ কথা ভেবে হঠাৎ প্রবল আবেগে আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল।

"আমি তারেই খুঁজি বারে বার"।

----------o----------

আমার দেখা রাঙ্গামাটি একদিন

ভোরের পবিত্র আজান, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ঘন্টা ধ্বনি ও ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটির দিন সূচিত হয় সাড়ম্বরে। পশ্চিমের ফুরা মঈনের সু-উচ্চ চূড়ায় প্রভাত সূর্যের প্রতিফলিত আলো ঝলমল করে প্রথম। তারপর ইহার ছটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বৃষ্টিস্নাত ফুরা মঈনের চূড়ায় হালকা মেঘেরা কখনও বাসা বাঁধে; কখনও বাতাসের বেগে হালকা আঁচল টেনে উড়ে যায়। সবুজ-বনে আশ্রিত পাখিরা কলরবে বাসা ছেড়ে যায়। বনের উদ্‌ভ্রান্ত হরিণগুলি ইতস্ততঃ ছুটে, ডাক দিয়ে ফিরে প্রভাত হল বলে।

সবুজ পাহাড় ও কর্ণফুলী হ্রদে ঘেরা ঘুমঘোর রাঙ্গামাটি শহর আস্তে আস্তে আড়মোড়া দিয়ে উঠে। কর্ণফুলী হ্রদের বুকে দ্বীপময় এ শহর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে। বেডবেডী, কলেজ গেইট, রাজবাড়ী, নিউ মার্কেট, বনরূপা বাজার, কাঠালতলী, তবলছড়ি, আসামবস্তী ও রিজার্ভ বাজারের ব্যবসা কেন্দ্রগুলি আবার সচল হয়ে উঠে। রিজার্ভ বাজারের জেটিঘাটে দূর পাল্লার লঞ্চগুলি নানীয়ার চর, মারিশ্যা, লংগদু, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি থানায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। রিজার্ভ বাজারের সন্নিকটে বাসস্ট্যান্ড হয় লোকে লোকারণ্য। এ স্টেশন থেকে চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নানীয়ারচর, কাপ্তাই, রাজস্থলী ও কাউখালীর বাস ছাড়ে। বেবীট্যাক্সীর শহর রাঙ্গামাটি। বেবীট্যাক্সীর যাতায়াতে সব সময় একটানা ঘর্ঘর শব্দে মুখর হয়ে উঠে।

পাহাড় গিরিকন্দর পেরিয়ে উপজাতীয়রা এ শহরে আসেন মাথায় থুরং নিয়ে নানা সাজ পোষাক পরে। থুরং এ ভর্তি থাকে পাহাড়ী নানা শাক-সবজী, বিশেষ করে বাঁশের কচি ডগা বাঁশকোঁড়া, জঙ্গলী কলার থোড়, পাহাড়ে প্রাপ্ত নানা শাক-সবজী, জুমে উৎপাদিত নানা ফসল ও তরিতরকারী। বনরূপা বাজারে পাওয়া যায় জঙ্গলী শুকরের মাংস, শামুক, ব্যাঙের মাংস ইত্যাদি।

দিন শুরুতে সুভলং মঈনের জলপ্রপাত ছাড়িয়ে জেলেরা আসেন যন্ত্রচালিত নৌকায় মাছ বিক্রির জন্য। বরকল, বাঘাইছড়ি, মাঈনী, জুরাছড়ি ও নানীয়ার চর থেকে আসেন কাঠ ব্যবসায়ীরা কাঠের ও বাঁশের নৌকা নিয়ে। রাঙ্গামাটির আশেপাশের জুমিয়া কৃষকেরা নিয়ে আসেন কলা, আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ফল।

রাঙ্গামাটি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বড় শহর। এখানকার চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ভাল। তাই এ শহরে রোগীরা আসেন চিকিৎসার জন্য, ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার জন্য ও ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্য। পর্যটকেরা আসেন হ্রদে ঘেরা রাঙ্গামাটি শহর ও আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার জন্য।

রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে বাস করেন বাংলাদেশের গৌরব বৌদ্ধদের একজন আধ্যাত্মিক গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়। যিনি কাপ্তাইয়ের নিকটবর্তী ধণপাতা নামক স্থানে ১৯৪৯-৬০ ইংরেজী পর্যন্ত গভীর বনে সাধনা করে "সাধনানন্দ ও বনভান্তে" উপাধি পেয়েছেন। তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্য আসেন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য বৌদ্ধ পূণ্যার্থী।

এ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ডিয়ার পার্ক একটি সুন্দর পর্যটন এলাকা। বিখ্যাত ঝুলন্ত ব্রীজ, ছোট ছোট কটেজ, হোটেল, মোটেল, পার্ক ও অজস্র ফুলে ছাওয়া এ স্থান মর্ত্যের স্বর্গসম বড় আকর্ষণীয়। ইহার পূর্ব পার্শ্বে কাপ্তাই হ্রদের জলরাশি। দূর বহু দূরে কুয়াশাময় পাহাড় শ্রেণী দেখতে অপরূপ। ঝুলন্ত ব্রীজের নীচে ঘাটে বাঁধা নানান চিত্রে চিত্রিত নৌকার বহর। পাহাড়ের কোলে চাটাই বিছানোর মত জুমিয়ার পাকা ধানের জুম ক্ষেত, দূরে বহু দূরে মরুভূমির উটের বহরের মত পাহাড়ের উপর সারিবদ্ধ বৃক্ষ শ্রেণী দেখে মন আপনি উদাস হয়ে যায়, হাওয়ায় ভর করে উড়ে যেতে চায় দূর দূরান্তে।

পর্যটন এলাকায় নৌকা ভ্রমণের জন্য নানা রং বেরংয়ের সাজানো নৌকা, যন্ত্র চালিত বোট, সাম্পান, লঞ্চ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। হ্রদে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আহবান জানায় পর্যটকদের হ্রদে ভেসে বেড়াবার। রাঙ্গামাটি শহরের পূর্ব উত্তরে পুরাতন রাজবাড়ী ও ডিসি বাংলো পেরিয়ে কিছু দূর এগুলে দেখা যাবে সুভলং মঈনের কি অপরূপ পাহাড়ের সারি! সেখানে পাহাড়ের কোনে হ্রদের বুকে কোন দিকে যে কর্ণফুলী লুকিয়ে থাকে টেরই পাওয়া যায় না। আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলে দেখা যাবে সুভলং মঈনের কি বিশাল অংশই না ভেঙ্গে কর্ণফুলী এগিয়েছে।

এ স্থানে কর্ণফুলীর দু'পার্শ্বের সু-উচ্চ চূড়া, বর্ষায় জলপ্রপাত গুলি ২০০ ফিট উপর থেকে ঝর ঝর করে কুয়াশার মত লাফিয়ে পড়ে। কি অপরূপ সে দৃশ্য!

সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার রাঙ্গামাটি শহর পর্যটকের আগমনে হয় লোকারণ্য। পর্যটনে আসা হাজার হাজার লোক ও শত শত গাড়ি যেন বিশ্রামে মগ্ন থাকে ভর দুপূরে। এ সময় কেউ খাবার খায়, কেউ কেউ রোমাঞ্চে কল্পনার পাখায় ভর করে বৃক্ষতলে আশ্রয় নেয়। রঙিন ফটো তুলে নিজের জীবন ও যৌবনের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টায়। আপন মনে সূর্য যখন দুপূর হয়, রূপালী হ্রদ যখন শান্ত হয়, যখন ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয় পরিবেশ আর তখনি যেন প্রকৃতি পাহাড়ী মেয়ের রূপ ধারণ করে ঘুম পাড়ানির গান গায়!

এক সময় দুপূর গড়িয়ে বিকেল হয়। পশ্চিম পাহাড়ে হেলে পড়া সূর্যের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। দূর পাল্লার লঞ্চ ও বাস যাত্রীরা যখন ক্লান্ত হয়ে রাঙ্গামাটি পৌছে, পর্যটকের মাইকের আওয়াজ যখন পাহাড়ী পথে দূর হতে দূরে মিলিয়ে যায়, বৃক্ষের হালকা ছায়া যখন ঘন ও গভীর হয় তখনই রাঙ্গামাটি শহরে আসা পাহাড়ীরাও রাস্তা চলতে থাকেন। তাঁরা চলতে থাকেন পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য। মুখে তাঁদের সারা দিনের ক্লান্তি।

দিনের সব পসরা যখন শেষ হয়; সন্ধ্যা নামে যখন পবিত্র আজানের ধ্বনিতে এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরে পুরোহিতের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে, বৈদ্যুতিক বাতিগুলি যখন অজস্র তারকার মেলা সৃষ্টি করে হ্রদের উপর এবং হ্রদ, পাহাড় ও উপত্যকার উপর দিয়ে যখন নির্মল হাওয়া বয়ে যায় তখনি রাঙ্গামাটি শহরকে কেমন যেন শ্রান্ত ক্লান্ত মনে হয়।

----------o----------

মারিশ্যা একটি জায়গার নাম

পঞ্চাশ দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মধ্যে একটি জেলা। এ সময় শিক্ষা-দীক্ষায়, যোগাযোগে সর্বদিক দিয়ে ছিল অন্যান্য জেলাগুলির চেয়ে ইহা অনুন্নত।

এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন রকম। জেলাটি ৩টি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলের উপজাতিয় রাজারা ছিলেন ভিন্ন

জনগোষ্ঠির। জেলার ডেপুটি কমিশনার ও মহকুমা প্রশাসকের পাশাপাশি তাঁরা সার্কেল প্রধান হিসাবে ভূমিকা রাখতেন সর্বক্ষেত্রে।

এ জেলার বিভিন্ন উপজাতি প্রজাগণ রাজনীতির ব্যাপারে তেমন কোন খবর রাখতেন না। জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছাড়া আর তাঁরা কিছু ভাবতেন না।

পার্বত্য চট্রগ্রামের বৃহত্তম নদী কর্ণফুলী বয়ে যেত আপন মনে। চট্রগ্রামের সেই জনপ্রিয় গান "লুসাই পাহাড়তুন নামিয়া যারগোই কর্ণফুলী" ঘরে ঘরে গাওয়া হত। একইরূপে এখানকার জীবন যাত্রায়ও একটা শান্ত প্রবাহ বয়ে যেত।

পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভে একটা জনরব উঠল। কর্ণফুলী নদী বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এজন্য সরকার কাজ শুরু করেছে। কাপ্তাই এলাকায় নানা যন্ত্রপাতির আমদানী ও বহু লোক জনের কথা আলোচনা হত গ্রামাঞ্চলে। রাঙ্গামাটি হতে চট্রগ্রাম পর্যন্ত লঞ্চে যোগাযোগ ছিল। যাঁরা লঞ্চে চট্রগ্রাম শহরে যেতেন তাঁরা এ সমস্ত খবর নিয়ে আসতেন।

অনেক গ্রামে এলপি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বড়ুয়া। তাঁরা প্রায়ই বলতেন এ সমস্ত জায়গা একদিন জলমগ্ন হবে। এ কথা চাকমা এবং অন্যান্য উপজাতিয়রা বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন না কর্ণফুলীতে বাঁধ দেওয়া যাবে। কারণ তাঁরা দেখত কি বিশাল মুর্তি ধারণ করে বর্ষায় কর্ণফুলী প্রবাহিত হত।

কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ হবে। এ বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন কোথায় যাবেন, কোথায় তাদের পুনর্বাসন হবে এসমস্ত ব্যাপারে দেওয়ান, কার্বারী ও গ্রামের মুরুব্বীদের মধ্যে আলাপ হত ঘন ঘন। ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ব্যর্থ লোকজন এ বিষয়ে তেমন অগ্রসর হতে পারতেন না।

কাপ্তাই বাঁধের নিম্নাঞ্চল এবং ১২০ ফিট জলমগ্ন হওয়ার হিসাব ধরে যখন জঙ্গল কাটার হিসাব ধরা হল তখন কেহই বিশ্বাস করতে পারলেন না সে হিসাব।

কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রানখিয়াং, কাচলং, মাইনী ও চেঙ্গী উপনদীর নিম্নাঞ্চল এবং কর্ণফুলীর অববাহিকা ভারত সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত পড়বে। কর্ণফুলীর বিধৌত সমভূমি জীবতলী, মগবান, বড়াদাম, রাংগাপানী, চাকমা রাজবাড়ী এলাকা, বালুখালী, চেঙ্গী নদীর মহাপ্রুম, নানীয়ার চর এবং কাচলং নদীর পাড়ে কাত্তলী, লংগদু, তুলবান এলাকা ছিল বিখ্যাত।

এ সমস্ত এলাকার লোকজনের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের কাজ ছিল ব্যাপক। জনাব আলী হায়দার খান, সহকারী পুনর্বাসন কর্মকর্তা, যিনি পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম বিভাগ

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর নাম স্মরণ করতেন সবাই। তিনি একজন সুশাসক এবং যোগ্য কর্মকর্তা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কাপ্তাই বাঁধের কথা যখন ব্যাপক আলোচনা হচ্ছিল এবং কাপ্তাই বাঁধের কাজ যখন সমাপ্তির পথে তখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস জন্মাল যে একদিন এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাঙ্গালী মুসলমান যাঁরা রাঙ্গামাটির আশেপাশে বালুখালী, ঝগড়াবিল, শিল পৈদাং ইত্যাদি স্থানে বাস করতেন তাঁরাও অনেকে বিভ্রান্ত হলেন নতুন কোন্ স্থানে যাবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে চীৎমরম এবং বান্দরবানের খাস জমি পছন্দ করলেন। তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমা সম্প্রদায় পছন্দ করলেন বান্দরবান এলাকা। অপর পক্ষে চাকমা ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পছন্দ করলেন কাচলং রিজার্ভ ফরেস্টের খাস জায়গায় বসবাস করতে।

সরকার যে যে এলাকায় খাস জমি আছে সে সমস্ত স্থানে বন্দোবস্তী দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে তাদের। তাই পুনর্বাসন এলাকা বলতে বুঝায় মারিশ্যা। মারিশ্যা এলাকায় পুনর্বাসন কাজ ছিল ব্যাপক। হাজার হাজার লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল এ জায়গায়।

তখন মারিশ্যা বলতে কাচলং পুনর্বাসন এলাকাকে বুঝাতো। কারণ বাঘাইছড়ি থানা সৃষ্টি হয়নি তখনও। দিঘীনালা থানার নিয়ন্ত্রণে ছিল এ এলাকা। মারিশ্যার অন্তর্ভুক্ত এলাকা ছিল দুরছড়ি, সিজক, বাঘাইছড়ি, রূপকারী এবং বাঘাইহাট অঞ্চল।

গভীর অরণ্য, খরস্রোতা কাচলং নদী এবং বনে হিংস্র জন্তু, নানা ধরনের বিষাক্ত সাপ ও পোকা মাকড়ের আবাস স্থল ছিল এ এলাকা। শত শত বছর ধরে রিজার্ভ ফরেস্ট হওয়ায় এখানে গজে উঠেছিল বিশাল বিশাল বৃক্ষ, বাঁশ ঝাড় এবং গোলা মরিচা বেতের ঝোপ। সপ্ততল দালান সমান উঁচু বৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে থাকত দৈত্যের মত বিশাল বিশাল ডাল পালা নিয়ে।

এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে এ স্থানে এসে বসবাস করতে কারও মন চায়নি। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে মারিশ্যা অবস্থিত হওয়ায় এবং ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে নিজস্থানে বসবাস করায় শ্রেয় মনে করলেন।

তখনকার দিনের মুদ্রামান ছিল অত্যধিক। ১ ভরি সোনার দাম ছিল মাত্র ১২০/১৪০ টাকা, এক টাকায় ৩ সের চাউল, সরিষা তৈলের দাম সের প্রতি ৩

টাকা, বড় মোরগের দাম ৩ টাকা, একটা ছাতার দাম ৩ টাকা এবং ২ টাকায় একটি রেডিমেড শার্ট পাওয়া যেত। অন্যান্য দ্রব্যাদিও সমহারে খুবই সস্তা ছিল। মারিশ্যা হতে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত লঞ্চের ভাড়া ছিল ৪ টাকা।

বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনে যাওয়া, নিজস্থানে বসবাস করা কোনটি ভাল হবে এ নিয়ে আলাপ আলোচনায় ২ বছর কেটে গেল। ইতোমধ্যে লোকজন সম্ভাব্য পুনর্বাসন এলাকা ঘুরে এসে নানা রকম গল্প ছড়াচ্ছেন। এর মধ্যে জমি-জমা ও বাগানের ক্ষতিপূরণের কথাও উঠেছে। অর্থ লোভ ও অবহেলার বিষয় নহে। অর্থ এবং পুনর্বাসনের জন্য অন্যত্র জায়গা পাওয়া গেলে স্থান ত্যাগের গররাজি হওয়ার কোন উপায় নাই।

উপজাতীয় জনসাধারণ সাধারণতঃ যাযাবর প্রকৃতির। উর্বর জুমের খোঁজে একস্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়া তাদের স্বভাব। তাই কোন স্থানের মায়া তাদের মনে গভীর শিকড় গাড়ে নি।

এ ভাবে আলাপ আলোচনা ও পুনর্বাসন প্রস্তুতির মধ্যে ১৯৬০ ইংরেজী এসে গেল। চাকমা রাজা ত্রিদীপ রায় স্বয়ং নিজ জায়গা হতে ৪ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর বাড়ী তৈরী করে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। জায়গা জমি ও বাগানের ক্ষতিপূরণও ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে রাঙ্গামাটি হতে সবাইকে।

এখন যাওয়ার পালা রইল বাকী। গ্রামের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। আত্মীয়-স্বজনেরমধ্যে একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বেদনা যেন ভুলার নয়। এ প্রভাব যেন পড়েছে পশু-পাখীদের মধ্যেও। কাপ্তাই বাঁধের পানির সীমানা অর্থাৎ ১২০ ফিট পর্যন্ত নীচু এলাকার সব বৃক্ষ কাটা হওয়ায় পাখীরাও ঘরের কাছাকাছি স্থানে বসার সুযোগ পায় না। তাদেরকে বসতে হয় দূরের পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে। তাই সকালে যে বুলবুলী পাখীটা কাছে এসে ডাকতো সে আর ডাকে না। ইতর প্রাণী কুকুর-বিড়ালদের মধ্যেও যেন একটা গ্রাম ছাড়া ভাব দেখা দিল। কেননা তাদের প্রভুরা তাদের সাথে কুকুর-বিড়ালকে নিতে চায় না। কারণ মারিশ্যা যাওয়ার পথে তাদের তরী যে ছোট্ট। মাল-সামাল গৃহস্থ লোকজনেই ভর্তি হয়ে গেছে।

১৯৬০ ইংরেজী। সেই বছর সরকারী ব্যবস্থা মতে চৈত্র মাসে নৌকা ছাড়ল নতুন পুনর্বাসন স্থান মারিশ্যার উদ্দেশ্যে। রানখিয়াং নদীর কেংড়াছড়ি, বিলাইছড়ি কর্ণফুলীর উভয় পাড়ের জীবতলী, মগবান, বালুখালী, বড়াদাম ও কাচলং নদীর

কাত্তলী, তুলাবান, লংগদু ইত্যাদি স্থান হতে নৌকা ছাড়ল। শত শত নৌকা এক সময় পৌছাল পাবলাখালী. দূরছড়ি, সিজকমুখ, বাঘাইছড়ি রূপকারী ইত্যাদি স্থানে।

মারিশ্যায় পুনর্বাসিত হওয়ার পর যে যে স্থান হতে এসেছেন তাঁরা সে স্থানের নাম পুরানো গ্রামের নাম অনুসারেই দিয়েছেন। যেমন, জীবতলী, তুলাবান, মগবান, গোলাছড়ি, ঝগড়াবিল, বালুখালী ইত্যাদির নাম পূর্বের নামেই হয়েছে।

পুনর্বাসনের সময় উপজাতীয় দলনেতা, চেয়ারম্যান ও হেডম্যানদের মধ্যে বাবু লাল বিহারী চাকমা, বাবু দ্রোণ কার্বারী, বাবু সুশান্ত কার্বারী, বাবু সূর্য খীসা, বাবু শরৎ বৈদ্য এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে জনাব আব্দুল হামিদ ও জনাব আব্দুর রাজ্জাক মাস্টারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সে সময় মায়নী মুখ বাজারের পর হতে ছিল গভীর জঙ্গল বা রিজার্ভ ফরেস্ট। মায়নী মুখ হতে মারিশ্যা যেতে খুব সাবধানে এগুতে হয়। হাতির পাল নীরবে চরে বেড়ায় রাস্তার পাশে। কোন কোন সময় দূরে শুনা যেত বাঘের গর্জন। নীচে ঝিলের ধারে গেছো ব্যাঙ গুলি ডাকতো বঁট বঁট বঁট। পুরাতন বৃক্ষ, ঝাড় এবং ইহার মধ্যে বসবাসকারী নানা আজব প্রাণী ও তাদের আচরণ কেমন যেন আদিমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিত।

কি একটা দুর্ভোগ হত সে সময়কার মারিশ্যা যাত্রীদের।

----------o----------

চাকমাদের বিঝু বাজার

চৈত্র মাসের শেষ দু'দিন এবং বৈশাখের প্রথম দিন এই তিন দিনকে চাকমারা বিঝু পর্ব বলে। এ পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য যে যে এলাকায় বাস করে সে সে এলাকার ঐ সপ্তাহের হাটবারকে বিঝু বাজার বলে।

বিঝু বাজার বৎসরে সবচেয়ে জমজমাট হয়। এ সময় চাকমাদের মধ্যে ছোট-বড়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই বাজারে যায়। কিংবা কেউ বাজারে না গেলেও আবদার থাকে কিছু কেনার। জুম ক্ষেতের জমানো কার্পাস, তুলা, তিল. যবধান, চাউল ইত্যাদি বিক্রি করে বিঝু উৎসবের জন্য জিনিষ ক্রয় করে। কেউ কেউ গরু, ছাগল, মোরগ, মুরগী এবং শুকর বিক্রি করে বিঝু উৎসবের জন্য টাকা যোগাড় করে।

যুবক যুবতীরা সেদিন বেতের তৈরী থুরুং মাথায় নিয়ে বাজারে যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটেন। ছোট ছেলে-মেয়েরা মোরগ-মুরগী এবং গৃহস্থরা কোন কোন সময় গরু-ছাগল নিয়ে বাজারে যায়।

বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাজারে সেদিন খুবই ভীড় জমায়। তাঁদের ভাষা হয় সেদিন খুবই মধুর ও মোলায়েম। কথায় কথায় তাঁরা পাহাড়ীদের দাদা, দিদি, বোন, মামা ইত্যাদি বলে ডাকেন। সারা বাজারে নানা জিনিষ পত্রের পসরা বসে। চাকমারা বিশ্বাস করে সারা বৎসর তামাক পান করে গলার মধ্যে তামাকের যে দাগ হয় তা তরমুজ খেয়ে পরিস্কার করতে হয়। তাই তরমুজ অবশ্যই কিনতে হবে। তরমুজ ও নানা ফলমূলের দোকান বসে বাজারের আনাচে কানাচে।

হরেক রকমের কাপড়-চোপড়ে ঝিলমিল করে কাপড়ের দোকান। চুড়ির দোকানে নানা ধরনের চুড়ি, লাল, নীল ফিটা, খেলনা ইত্যাদি।

পাচন তৈরীর শুটকী বেপারীরা নিয়ে আসেন মূল্যবান রূপচাঁদা, ঘন্যা শুটকী, ইছা, ছুড়ি শুটকী। সেগুলো থরে থরে সাজানো হয়।

বেলা দুপুর হতেই সর্বক্ষেত্রে একটা চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়ী লোক যাঁরা দূরের ও কাছের এবং যাঁরা বিভিন্ন স্থান হতে নানা ধরনের মালামাল আনেন বেলা দূপুর না হতেই তাঁদের সব জিনিষ বিক্রি হয়ে যায়। এখন তাঁদের প্রত্যেকের হাতে টাকা।

ইতোমধ্যে যুবতী মেয়েরা ভীড় করেছে চুড়ির দোকানে। কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা, আংটি, কানের দুল, লাল, নীল ফিটা, সুগন্ধী তেল ইত্যাদি কিনছে। বাঙালী ব্যবসায়ী 'দিদি, এটা খুবই ভাল, আপনাকে মানিয়েছে, এটি বিলাতি লিপস্টিক, এটা নিন। এ মালায় দামী মুক্তা আছে। খুব সুন্দর'। এরূপ আকর্ষণীয় ও মন মাতানো মধুর বাক্য ব্যবহার করে হরদম বিক্রি করেন। মেয়েরাও ঘুরে ঘুরে পকেটের পয়সা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মালামাল কিনে।

যুবকেরা ভীড় জমায় বাঁশির দোকানে। কাপড়ের দোকান হতে তারা কিনে সূতি কাপড়ের শার্ট গামছা, লুঙ্গি, ও ধুতি, স্নো, পাউডার, সুগন্ধি তেল ও আতর। পায়ের স্যান্ডেল, অল্প দামের কোমর বন্ধনী। বাজী করের দোকান হতে গোলাক ও হাউই বাজি ইত্যাদি কিনে। নিজ নিজ প্রেমিক ও প্রেমিকার জন্য সুন্দর আয়না রুমাল ইত্যাদি।

মুদির দোকান হতে নারিকেল, কিশমিশ, আঁখের গুড়, পিঠা বানানোর জন্য সরিষার তেল, রঙিন কাগজ, মোমবাতি, আটা, ময়দা, বিড়ি, সিগারেট, সুপারী, পান ইত্যাদি কিনে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গাছের ছায়ায় বসে বসে ভাবেন তাঁরা কি কিনবেন। স্মরণ করেন তাঁরা তাদের অতীতের স্মৃতি। তাঁদের আগেকার রুচিবোধ এখন আর নেই। বৃদ্ধ বাজার হতে কিনেন ধুতি, স্যান্ডেল, তালপাতার হাতপাখা, নাতি-নাতনীর জন্য কিনেন নানান খেলনা। বৃদ্ধা বাত ব্যাধির জন্য কিনেন ঔষধ এবং খাবার জন্য পিঠা, জিলাপী ইত্যাদি। গায়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা কিনেন চাদর।

কাঁচা বাজারেও জমেছে ভীড়। পাচন তরকারীর জন্য মিষ্টি আলু, লাউ, টমেটো, গোল-আলু, জঙ্গলী তারার শাঁস, ও অন্যান্য জিনিষ কিনে দেদারছে তাঁরা।

মাংসের দোকানে বেলা দুপুর না হতেই সব মাংস বিক্রি হয়ে যায়। শুকরের মাংস, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির মাংস সবই বিক্রি হয়ে যায় নিমিষে। ছোট ছেলে-মেয়েরা কাপড় ও চুড়ির দোকানে ভীড় করে। বাবা অথবা মাকে ধরে আবদার করে জিনিষ কিনে দেয়ার জন্য। নিজের জমানো পয়সা খরচ করে তারা কিনে নানা রং বেরংয়ের পিঠা, চুড়ি, টিনের হুইসেল, বাঁশী, বেলুন, খেলনা ইত্যাদি। প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রী কিনেন আগামী বছরের জন্য গৃহ সরঞ্জাম বাসন, হাঁড়ি, পাতিল, গ্লাস, কাপ-পিরিছ, দা, খোন্তা, শীতল পাটি, কাপড়-চোপড়। তাঁতে বোনার জন্য মিলের সূতা রেশম ইত্যাদি।

বাজার যখন জমজমাট, সবাই যখন কেনা-বেচায় ব্যস্ত তখন একদল যুবক লাফালাফি করে গান গায়। তাদের হাতে তাল পাতার হাত পাখা। তারা গাইছে -

"বিঝু বাজারত কিছু নেই
পরাণ জুরানী ইদু নেই"।।

এ বাজারে কেনার জন্য সে কিছুই পাচ্ছে না। মন্দিরে বৌদ্ধ মেলায় বা মহামুনি বৌদ্ধ মন্দিরে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে গান গেতে পারলে সে আনন্দ পেত। সেখানে তার প্রেয়সীর সাক্ষাৎ পেত। গানের তালে তালে হাত পাখা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা নাচে। তাদের চপলতা দেখে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ফোকলা দাঁতে হেসে হেসে মাথা দোলায়। ছোট নাতি-নাতনীরা ফোতনার বাঁশি বাজিয়ে তাদের চেয়ে থাকে।

পূর্বে যারা দূর দূরান্ত থেকে এমনকি দুইদিনের রাস্তা হেঁটে বাজারে আসে তারা অন্ততঃ তিন মাসের জন্য লবণ, চিদল শুটকী কিনে। কালবৈশাখীতে বৃষ্টি নামলে জুমের ক্ষেতে কাজের ধুম পড়ে যাবে। তাই তাদের পক্ষে সে সময় আর

বাজারে আসা সম্ভব হবে না। বিঝু পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য তারাও যথাশীঘ্র বাজারের কাজ শেষ করে বাড়ীর পথে রওয়ানা দেয়।

বেলা গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সবাই বাড়ী ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। বিঝু বাজার চাকমাদের বৎসরের মিলন মেলা। বহুদূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়রা আসে। তারা একে অপরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে। বিঝুর নিমন্ত্রণ জানায়। সম্ভব হলে একে অপরকে উপহার দেয় ও আর্থিক সাহায্য করে।

বেলা পড়ে এলে সবাই বাড়ীর পথে অগ্রসর হয়। মনে পর্ব উদ্‌যাপনের নানা ভাবনা। ছোট শিশু মায়ের পিঠে চড়ে, ছেলেরা বাপের হাত ধরে বাড়ী ফিরে। পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। ছড়াছড়ির পথ বেয়ে পাহাড় অতিক্রম করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আহা-উহু শব্দে বাড়ীর পথে অগ্রসর হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে বাজারে। মানুষের গুঞ্জন ক্রমে স্তব্ধ হয়ে আসে। দোকানে দোকানে পেট্রোম. ক্স, ল্যাম্প, খুপী বাতি জ্বলে উঠে। বৃদ্ধ মহাজন ক্যাশ বাক্সে বসে আজ বিঝু বাজা:. বিক্রয় প্রাপ্ত টাকার হিসাব করেন একশ, দু'শ করে।

তাঁর কপালের রেখা ভাঁজ পড়ে। পুরু চশমায় টাকা গুণা শেষ করে কাপড়ের থলেতে টাকা ভরতে ভরতে বলেন, "উনচল্লিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা তেপ্পান্ন পয়সা।" জবর বিঝু হয়েছে তো?

তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে।

----------o----------

ফিরে এল বিঝু

বাংলা সনের চৈত্রের শেষ। পাহাড়ে জুম পোড়ানো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ। কেমন যেন ধুমল। সূর্যের আলোটাও ম্লান।

পাহাড়ের চূড়ায় উঁচু বৃক্ষের মগডালে বসে বিঝু পাখিটি 'বিঝু' 'বিঝু' করে ডাকছে কয়দিন আগে থেকে। ভোরের বেলা বন মোরগটাও ডাকে ঝোপ-ঝাড় হতে। নিঃসঙ্গ পাহাড়ী উপত্যকায় ভোর বেলা নাম না জানা নানা পাখি অট্টহাসি দিয়ে উঠে থমকে মহাআনন্দে। দোয়েল, কোয়েল, ফিঙ্গা ও কোকিলটিও সুর মিলিয়েছে এক সঙ্গে।

'বিঝু এসেছে'।

পাহাড়ী এলাকার প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ, ছোট ছেলে-মেয়ে সবাই বিঝু উৎসব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাপড়, চোপড়, বিছানাপত্র যার যা আছে সবই ধুয়ে পরিস্কার করছে। ঘরের আনাচে কানাচে যেখানে ময়লা আবর্জনা রয়েছে সবই পরিস্কার করা হচ্ছে। মাটির ঘর, মাটির চুলা সবই লেপে ঝেড়ে পরিস্কার করে নিচ্ছে।

বিঝু কি? কখন হতে বিঝুর প্রচলন হয়েছে কেউ জানে না। তারা জানে, বিঝু অর্থ শুধু আনন্দ ফুর্তি করা। বিঝু মানে আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসা। বিঝু মানে নানা রকমের পিঠা খাওয়া এবং ঘরে ঘরে বেড়াতে যাওয়া। বিঝু মানে ধর্ম কর্ম করা এবং পুরানো পাপ ধুয়ে মুছে ফেলা। বিঝু মানে প্রেয়সীর সাক্ষাৎ পাওয়া।

চৈত্র মাসের শেষ দিনের আগের দিন ফুলবিঝু। বসন্তের বিদায়ক্ষণে সারা বন প্রান্তর ফুলে ফুলে ভরে উঠে এ সময়। বিঝু ফুল নামে এক প্রকার ফুল আছে এবং যে ফুল দেখতে শিউলি ফুলের মত দেখায়, তা যেমন সুঘ্রাণ তেমন দেখতে সুন্দর। বিঝুর সময় গন্ধরাজ, জুঁই, বেলী, নানা ধরণের ফুলে ভরে উঠে সারা বাগান। গোলাপ, টগর, জবা ফুলও ফোটে। কৃষ্ণ চূড়ার ডালে ডালে রং লাগে এ সময়।

বিঝুর প্রথম দিন অর্থাৎ ফুলবিঝুর দিনে ছোট শিশুরা খুব ভোরবেলা ঘুম হতে উঠে ফুল তুলতে বাগানে দৌড় দেয়। তখন অনেক লোক ফুলের খোঁজে ঘুরাঘুরি করে। ঝুড়ি ভর্তি ফুল নিয়ে তারা সারা সকাল মালা গাঁথে। কেউ কেউ টবে নানা ধরনের ফুল ও পাতা সাজায়। ঘরের দুয়ারে ফুলের মালা টাঙ্গিয়ে রাখে। ছোট ছেলে-মেয়েরা ভক্তিভরে আনন্দ অতিশয্যে মা-বাবা ও বড়জনদের টুক করে সালাম করে। মেয়েরা নানা ফুল দিয়ে সাজানো খোপায় চুল বিণ্যাস করে। ভোরে ছড়ায়, নদী বা পুকুরে স্নান করে। অনেকে ফুল হাতে বৌদ্ধ বিহারে গমন করে।

বিঝুর প্রথমদিন। আহা! আজ কি মজা! আজ কেউ কিছু বলবে না। ছাত্রদের পড়তে বলবে না। চাকরদের কাজ করতে বলবে না। আজ বিবেকের তাড়নায় যার যার কাজ সে করছে। আজ সারাদিন শুধু আনন্দে কাটবে।

গ্রামের এক পাশে বড় তেঁতুল গাছটার তলে এতক্ষণ জটলা হচ্ছে। আজ পাহাড়ী ঘিলা খেলা হবে যুবক ও যুবতী দলের মধ্যে। অন্য দিকে শক্ত কাঠের তৈরী লাটিম খেলা চলছে। বিকালে ফুটবল ও বলি খেলার আয়োজন চলছে। প্রতি ঘর ঢেঁকির শব্দে সরগরম। চাউলের গুঁড়ি তৈরী করছে। বিকালে পিঠা বানাবে। এ সব ভেবে আনন্দে মন ভরে উঠে।

সে দিন কেউ খেলাধূলা, কেউ বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে কেউ কাপড় কেচে সকাল বেলা অতিবাহিত করে। ক্ষণে ক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকাল ঘনিয়ে আসে। পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে শুরু করে। এ গ্রাম হতে অন্য গ্রামে যে যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তারা অবশ্যই নতুন জামাইসহ বেড়াতে আসবে। অপর পক্ষে অন্য গ্রাম হতে যে যে ছেলে বৌ এনেছে তারা শ্বশুরবাড়ী যাবে। ইহাই বিধান। ইহাকে বিঝু বেড়ান বলে।

বিঝুর দিন বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরে মেলা বসে। যুবক-যুবতী ছেলে মেয়ে সেখানে যায়। বিশেষ করে চট্টগ্রামের মহামুনী, চীৎমরম বৌদ্ধ বিহার এবং বান্দরবানের বোমাং ও মানিকছড়ির মং রাজার মন্দিরে মেলা বসে। নাচগান, যাত্রা দোলনা, পুতুল নাচ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে এ মেলায়। পাহাড়ীদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল মন্দির প্রদক্ষিণ। ধর্মীয় আবেগে নারী পুরুষ সমবেত ভাবে নাচগান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করবে। চাকমারা এ সময় উভাগীত গেয়ে উচ্চস্বরে রেইং দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। মেলায় আগত যুবক-যুবতীদের মধ্যে অনেকে সে দিন মন দেয়া নেয়া করে এবং পরবর্তীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। ছোট ছোট ঘরে খুপী বাতি জ্বলে। বৌদ্ধ মন্দিরে, ঘরের আনাচে কানাচে, গোয়াল ঘরে, নদীর পাড়ে মোম জ্বালিয়ে দীপাবলীর উৎসব করে এ সময়। ধুপ ধুনার গন্ধে মাতোয়ারা হয় পল্লী।

ফুল বিঝুর দিন পিঠা বানানোর কাজ চলে বিকাল বেলা। চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরী হয় সান্যে পিঠা। চাকমা ভাষায় 'সান্যা' অর্থ 'এ রকম পিঠা' আখের গুড় ও নারিকেলের কুচি কলার থোড়ের মত দু'দিক সরু এবং মাঝের অংশটি বড় করে বানানো হয় ইহা। বিন্নি পিঠা বিন্নি চালের গুঁড়া ও নারিকেলের ছোট-ছোট টুকরা দিয়ে পিত্যা পাতা নামে এক প্রকার জঙ্গলী পাতায় মোঁচা বেঁধে তৈরী করা হয়। আকারে যা দেখতে ত্রিভুজাকার দেখায়। তাছাড়া বড়া পিঠা ও কলা পিঠা চাকমাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। কেউ কেউ ধেনো মদ, জোগড়া তৈরী করে রাখে অতিথি আপ্যায়ণের জন্য। এ ভাবে আগামীকাল মূল বিঝু, এ আনন্দের কথা ভেবে ছেলে-মেয়েরা গভীর রাতে শুতে যায়।

মূল বিঝুর দিন খুব ভোরে হঠাৎ বাজী ফাটানোর শব্দ হয় একস্থানে। পাশে আরেকটি। কিছুক্ষণ পর একটার পর একটা বিকট শব্দে বাজী ফুটতে থাকে। এ সময় বিছানায় শুয়ে থাকা আর সম্ভব হয় না। বিঝুর উৎসবটা যেন তোপধ্বনির মাধ্যমে আহবান জানানো হয়।

বিঝুর দিন সব বাড়ীর লোকজন ঘুম থেকে উঠে প্রথমে নদীর ঘাটে স্নান করতে যায়। বড় ছেলেরা হৈ হুল্লোড় করে স্নান করে। উপরে পানি ছিটিয়ে তা হতে এক ফোটা পানি খেয়ে বলে, 'বিঝুগুলো খেলাম' অর্থাৎ বিঝুর ফল খেলাম। ছোট শিশু যারা তাদের সাথে স্নান করতে যায় তাদেরকে বলে, 'বিঝুগুলো খাও'। সকাল বেলা স্নান ছেড়ে এসে তারা নতুন জামা-কাপড় পরে। বিঝুর জামা পরা খুবই আনন্দের। গরীব ছেলে-মেয়েরা বহুদিনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এই জামা তৈরী করে।

আজ মূল বিঝু।

এ দিন চাকমা সমাজে প্রাণী হত্যা নিষেধ। আজ গালাগালি দেয়া, কাজ করা, অন্য কোন ঝামেলায় যাওয়া সম্পূর্ন পরিত্যাজ্য। এ দিনকে মধুর করার জন্য চাকমারা পরস্পরকে আদরের ডাক লক্ক, চিত্তি, পরানান, ধন, এবং সম্মানের ডাক আজু, নানু, বেই, মামা, পিছি তৎসঙ্গে ওয়া প্রত্যয় যোগে যেমন চিত্তিবুয়া ইত্যাদি নামে ডাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি যাতে সকলের নিকট স্বাভাবিক থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে সবাই সেদিন যার যার কাজ করেন।

সকাল বেলা চন্দনের পানি, তাতে কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে এক প্রকার রং তৈরী করে ছোট ছেলে-মেয়েরা ছোট কোটায় ভরে নেয়। ঘর ঘুরে বেড়াবার সময় ছোট ছেলে-মেয়েরা বড়দের প্রণাম করে কঞ্চি দিয়ে একফোঁটা ভাগ্য তিলক পড়িয়ে আশীর্বাদ কামনা করে। তাদের কারো কারো সাথে বেতের ঝুড়িতে ধান ও চাউল থাকে। তারা উঠানে মোরগ 'হয়, হয়' শব্দে ডেকে ছোট ঝুড়ি হতে ধান চাল ছিটিয়ে দেয়। এ দিন যেন কেউ উপোষ না থাকে। এ হল চাকমাদের উৎসবের রীতি।

মোরগ মুরগীরা আজ খেয়ে আর কুল পায় না। ছিটিয়ে থাকা ধান চালের প্রতি যেন তাদের লোভ নেই। কিছুক্ষণ খেয়ে ধেয়ে ঘরের নীচে, বাঁশের ও গাছের লাকড়ির স্তুপে গা ঝাড়া দিয়ে ঝিমায়। মহিষ, গরু, ছাগল আজ সবাই মুক্ত। গোয়াল হতে ছেড়ে দিয়েছে সবাইকে। কেউ চরাতে যাবে না আজ তাদের।

মোরগ মুরগীকে খাবার দেয়ার পর ছেলেরা এতক্ষণ যারা দল বেঁধে এসেছে তারা ঘরে উঠে বসবে।

ইতিমধ্যে গৃহিণী বড়া পিঠা, সান্যে পিঠা যা যা রাতে তৈরী করেছেন তা এনে পরিবেশন করেন। তৎসঙ্গে সাধ্যানুযায়ী অন্যান্য খাবারও পরিবেশন করেন। ছেলেরা হৈ, হুল্লোড় করে পিঠা খেয়ে তারিফ করতে করতে চলে যায়। ইতিমধ্যে আরও একদল এসে যায়। এভাবে চলে দুপুর পর্যন্ত।

দুপুরের খাবার ব্যাপারে কারও ঠিক থাকে না সেদিন। সময় হলে খেয়ে নেয় যে যার ইচ্ছা যেখানে। এদিন নানা ধরনের খাবার রান্না করা হয়। যেমন শুকনা মাংসের তরকারী, শুটকী দিয়ে পাঁচ মিশালী পাচন, বিন্নি ভাত, পায়েস ইত্যাদি।

শিশু কিশোরের দল চলে যাওয়ার পর আসে যুবার দল। হৈ, চৈ করতে করতে তারা আসে। পিঠা ও অন্যান্য খাবারের সাথে সামাজিক প্রথানুসারে তাদের দিতে হয় মদ, জোগরা ইত্যাদি। চাকমা ভাষায় গান গেয়ে ফুর্তি করে তারা।

"দারুতুলি হরিণ শিং
বজর মাদাত এক্য দিন"।।

হৈ-হৈ করে উচ্চস্বরে রেইং দিয়ে তারা উল্লাস করে।

মেয়েরা সাধারণতঃ ঘরের অতিথি আপ্যায়নে ব্যাপৃত থাকে। নতুন পোশাকে হাসি আনন্দে তারাও এক সময় পার্শ্ববর্তী ঘরে বেড়িয়ে আসে।

এ ভাবে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। আবার ঘরের বিভিন্ন স্থানে গোয়াল ঘরে, ধানের গোলায়, নদীর ঘাটে মোমবাতি জ্বালিয়ে সেদিনও দীপাবলী উৎসব করা হয়।

বিঝুর দিন সারাদিন খাওয়া দাওয়া ও মদ্য পানে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে অনেকে ঘরে ফিরে। অনেকে বন্ধু-বান্ধবের ঘরে রাত কাটায়।

রাতের শেষ, দিন শুরু। সে দিন বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। চাকমারা এ দিনকে গর্যপর্যা দিন বলে। গতকালের ক্লান্তি, আজ তাঁরা আলস্যে কাটাবে দিন। বাড়ীতে আবার ভাল খাবারের আয়োজন করা হবে। অনেকের বিশ্বাস, বছরের প্রথম দিনে ভাল খাবার পেলে সারা বছরই ভাল খাবার পাওয়া যাবে।

ঐ দিন গ্রামের ওঝা বৈদ্যদের নানা কাজ। সেদিন তাঁরা মন্ত্রপড়া পানি পান করায় সবাইকে। তাঁরা মন্ত্র দেয় যাতে সারা বছর কোন রোগ মহামারীতে কেহ আক্রান্ত না হয়। কোন কোন চাকমা বৈদ্য মোরগের ঠোঁটে চাকমা ভাষায় 'আং' অর্থাৎ যাদুমন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অক্ষর লিখে দেয়। ইহাতে মোরগের ডাক শোনা স্থান পর্যন্ত ভুত, প্রেত ও অনিষ্টকারী আত্মাগুলি আসতে পারে না।

এ কয়দিন বিঝু পর্বের প্রস্তুতি, উদ্‌যাপন, আত্মীয়-স্বজনের আগমনে প্রত্যেকের ঘর ছিল সরগরম। পর্ব উদ্‌যাপন করার পর আর সে আনন্দ থাকে না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে সব কিছু। এখন বেড়াতে আসা মেয়ে জামাই নিজ নিজ বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়। মেয়ে বাপের বাড়ী হতে মুরগীর ছানা, জুম ক্ষেতে বপন করার জন্য ভুট্টা, শশা, চিনার, বেগুন ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করে নেয়। তখন

পরিবেশ হয় বিয়োগ বিধুর। নতুন জামাই ও মেয়ে দাদা নানীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। মা ও বাবা পথ আগলিয়ে থাকে। মেয়ে ও জামাইকে ছেড়ে দিতে চায় না মন। পরিবারের সুখ শান্তির জন্য তাঁরা আশীর্বাদ করেন এবং নানা উপদেশ দেন। অবশেষে তারা বিদায় নেয়।

খুশীর দিন দ্রুত ফুরিয়ে যায়। নিষ্ঠুর সময়টা তরতরিয়ে অতিবাহিত হয়। 'কালা পানিত মালা ভাসে' চাকমা ধাঁ ধাঁর অর্থ হল কালো আকাশে সূর্য সাঁতার কেটে কেটে ডুবে যায়। সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আপন গতিতে এক সময় পাহাড়ের কোলে টুপ করে ডুব দেয় সূর্যটা। নিঃসঙ্গ পাহাড়গুলি তখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

সে দিনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানো হয় পূর্বের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে। কিন্তু এ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে নেই তেমন কোন আবেশ। খুপী বাতির আলোকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খাওয়া দাওয়া সেরে পূর্বের স্মৃতি স্মরণ করে বলে, 'জবর আনন্দ হয়েছে বিঝুতে'।

----------o----------

শিকার

কেংড়াছড়ি গ্রাম। খরস্রোতা রানখিয়াং নদীর তীর ঘেঁষে গ্রামটি অবস্থিত। নদীর ধারে জনবসতিহীন পাহাড়, ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় আর পাহাড়ী ছড়া। ছড়ার ধারে অপ্রশস্ত ঝিড়ি। তাতে মাটি কেটে কেউ কেউ চাষ করে। পাহাড় হতে নেমে আসা ছড়ার ধারে ধারে দেখা যায় বন্য কচুর ক্ষেত, ঢেঁকি শাক, কাওল ঢেঁকি নামক এক প্রকার ডাঁটা, যা চাকমারা সবজী হিসাবে খায়।

কেংড়াছড়ি মৌজার কেংড়াছড়ি গ্রাম। জমি চষে, জুম ক্ষেতের ফসলে অন্যান্য পাহাড়ী এলাকার লোকজনের চেয়ে তারা কিছুটা স্বচ্ছল। প্রায় ৮০/৯০ পরিবারের মত লোক একই সমাজে বাস করে। সুখে দুঃখে তারা একে অপরের কাছে এগিয়ে আসে। জুমের প্রথম পাকা ধান অভাবের দিনে তারা ভাগাভাগি করে খায়। খেলাধূলা, সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যুর পর রথ টানাটানিতে ও বিবাহ উৎসবে তারা এক জোট হয়ে থাকে।

গ্রামের চর্তুপার্শ্বে পাহাড়। সেই পাহাড়ে জুম ক্ষেত। বর্ষ পরিক্রমায় নানা কাজ। চৈত্র মাসে কাটা জুমে আগুন দেয়া হয়। সে আগুন জুম ক্ষেত ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে। দুই তিন দিন যাবত একটানা পুড়তে থাকে জঙ্গল। কোন কোন সময় চৈত্র

মাসের মাতাল হাওয়ায় শুকনা গাছ ও লতাপাতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দাবানলের মত বনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

জুম ক্ষেতে আগুন দেয়ার সাথে সাথে সহস্র হাউয়ের মত স্ফুলিংগ উঠে। বাঁশ ফাটার বিকট শব্দে বনের প্রাণীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে থাকে। তখন বাঘে গরুতে একঘাটে পানি খায়। ছড়ার ধারে যেখানে সবুজ স্থান কিংবা যেখানে আগুনের লেলিহান শিখা এগুতে পারে না সেখানে বন্য হরিণ, শুকর, খরগোস, অজগর সাপ, আশ্রয় নেয়। কোন কোন সময় বনের ভালুক, কেঁদো বাঘও সেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়।

কেংড়াছড়ি গ্রামের পত্যারাম তার জুম ক্ষেতে বেড়াতে এসে দেখল যে, চারিদিকে পাহাড়গুলি পুড়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে। পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে সমস্ত বন উপবন। এ দৃশ্য দেখে সে খুশী হল। মনে মনে ভাবল, গত বৎসর এ জায়গায় সে একটি শুকর দেখেছিল, বনের হরিণটাও মাঝে মাঝে হং হং শব্দে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করত। এখন তারা কোথায় গেল? পত্যারাম পাহাড় বেয়ে সামনে আরও এগিয়ে গিয়ে দেখল, চারদিকে পোড়খাওয়া জঙ্গল এবং মাঝখানে সবুজ বন। মনে মনে ভাবল, এ সব জানোয়াররা এ জঙ্গলে আশ্রয় নিতে পারে।

সে গ্রামে ফিরে এল। বিষয়টি গ্রামের মনচান কার্বারীকে জানাল। মনচান কার্বারী সবাইকে এ খবরটি দিলেন।

গ্রামের চিগনচোগা একজন শিকারী, তার দু'টি কুকুর আছে। বরখুলার একটি গাদা বন্দুক আছে। তাই তারা ঠিক করলো যে, একদিন ঐ পাহাড়ে গিয়ে তারা শিকার ধরবে।

গ্রামের পরচান, মনচান, বরখুলা চিকনচোগা, দোলাকানা, ধণারাম, প্রহরচান সবাই সেদিন যাত্রা করল শিকার করার উদ্দেশ্যে। ৩০/৪০ জন লোক বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে হৈ হৈ, রৈ রৈ টিনের ও ঢোলের শব্দে এগিয়ে গেল। সঙ্গে শিকারী কুকুরের দল।

নীচে শান্ত ছড়াটি নিঃশব্দে বয়ে চলছিল তখন। চৈত্রের দূপুরে শ্রান্ত ক্লান্ত জানোয়ারগুলি সে সময় পানি পান করছিল তৃপ্তির সাথে। পাখিগুলি আনন্দে নাচা-নাচি করছিল গাছের ঝোপে ঝোপে।

এমন সময় কড়া নাকারার শব্দে চারিদিক থর থর করে কেঁপে উঠল পরিবেশ। লোকের কোলাহল এবং ঢোলের শব্দ নিকটবর্তী শিলাময় পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হতে লাগল।

শব্দ শুনে হঠাৎ বন্য প্রাণীগুলির হৃদকম্প শুরু হল। তারা আর শান্ত থাকতে পারছে না একস্থানে। বিশেষ করে শিকারীরা কুকুর লেলিয়ে দিল জঙ্গলে। শিকারী কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ শব্দে এগিয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর।

শিকার খোঁজার জন্য আসা লোকজন ইতিমধ্যে ধামা, বন্দুক, বাঁশ ও গাছের ছুঁচাল বর্শা নিয়ে সম্ভাব্য শিকার গমনাগমন স্থানে বসে পড়েছে। একদল লোক গাছের ডাল, ঝোপ ঝাড় নেড়ে আরও এগিয়ে চলল। ক্রমে জাল তোলার মত জায়গা সংকীর্ণতর হতে লাগল।

এমন সময় সামনের জঙ্গল থেকে হঠাৎ কি যেন একটা দৌড়ে গেছে বলে মনে হল। শিকারীরা চিৎকার দিয়ে উঠল। এই যায় -- শব্দে সবাই মার মার শব্দে সামনে অগ্রসর হতে লাগল।

কিছুক্ষণ গর বন্দুকের শব্দ শোনা গেল গু-রুম। তৎসঙ্গে শোনা গেল বন্য শুকরের আর্ত চিৎকার। আহত শুকরটি পালানোর সময় কালাবিজা চাকমার বাঁ পায়ে জোরে কামড় দিল। কালাবিজা যন্ত্রনায় কাতর হয়ে ছটপট করতে লাগল। এমন সময় মনচান, চিগনচোগা, বড়খুলা এসে পড়ল এবং জোরে জোরে শুকরটার পিঠে আঘাত করতে লাগল। ক্রমে আঘাতে আঘাতে শুকরের কান্না ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল।

ঐ দিকে আবার কি যেন একটা দেখতে পেয়েছে অন্য শিকারীরা। হ্যাঁ, সেদিকে দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেল কি যেন একটা কাল বস্তু থর থর করে বড় গাছ বেয়ে নেমে আসছে। মুহূর্তে গোঁ গোঁ শব্দে সে দোলাকানার গায়ের উপর যেন উঠে পড়েছে। এক পা দু'পা করে দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। হাত দিয়ে আঁচড় দিবার চেষ্টা করছে। তার দু'চোখে আগুন। দোলাকানা দেখল, একটি বিরাট ভালুক। ভালুকের কেশরগুলি যেন পাখির পালকের মত খাঁড়া হয়ে উঠেছে।

দোলাকানার হাতে দোফালা এক গাছের ডাল আর হাতে একটি রামদা। এগিয়ে আসছে জানোয়ারটা। দোলাকানা এক পা, এক পা করে পিছিয়ে যায়, একটি সুযোগ খুঁজে দোফলা গাছটা ভালুকের গলায় লাগানোর জন্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখেছে তীক্ষ্ণভাবে। কে কাকে ধরে, শেষ চেষ্টা করছে তারা। এভাবে সুযোগ খুঁজে খুঁজে একসময় ঢালু জায়গায় সে সুযোগটা পেল দোলাকানা। ভালুকটা লেজ উচিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে যেই দোলাকানার উপর লাফ দিল অমনি হট করে সে দোফালা গাছটি গলায় লাগিয়ে মুহূর্তে ভালুকটার বুকে যেখানে সাদা চামড়া আছে সেখানে জোরে দাওয়ের কোপ দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল

ভালুকটির বুক হতে। আস্তে আস্তে সেও নিস্তেজ হয়ে এল। ভালুকটি হত্যা করে দোলাকানা আনন্দে নাচতে লাগল।

অন্যদিকে অপরাপর শিকারীরা বনের মধ্যে একটি গুই সাপ ও মস্ত বড় একটি হরিণ ধরেছে। এ ভাবে তারা জঙ্গল হতে নানা বন্য প্রাণী শিকার করল সেদিন।

সূর্য তখন পশ্চিম গগনে থর থর করে অস্ত যাওয়ার উপক্রম করছে। তাই সবাই ডাকাডাকি করে তারা জঙ্গলের এক প্রান্তে একত্রিত হল। তারপর শিকার করা শুকর, ভালুক, গুইসাপ ও হরিণ নিয়ে তারা গ্রামের দিকে চলল। বাঁশের ঝুঁড়িতে করে আহত কালাবিজাকেও তারা ভার করে নিয়ে চলল।

গ্রামের কাছাকাছি আসতেই তারা মৃত জন্তুগুলিকে এক জায়গায় রাখল। এগুলির চামড়া খুলে তারা মাংস কুটল। তারপর যতজন শিকারে গেছে তত ভাগে মাংসের ভাগ বসালো। তাছাড়া গ্রামের মৌজা প্রধানের জন্য সম্মানী অংশ শুকরের একটি রাণ রাখলো। বন্দুকের আলাদা অংশ এবং যে যে শিকার ধরেছে তাদের জন্যও আলাদা অংশ রাখল।

এ ভাবে বিভিন্ন জাতের পশু মাংসের ভাগ এক জায়গায় মিশিয়ে তারা যার যার বাড়ী অভিমুখে চলল। তখন গ্রামে সন্ধ্যা নেমেছে। আজ রান্না হবে ভাল, এ চিন্তায় সবাই মশগুল।

শুধু কালাবিজা আহত অবস্থায় গোঙাচ্ছে। আর আফসোস করছে কেন সে শিকারে গেছে! অন্য প্রাণীর লোভ করতে গিয়ে আজ তার এ অবস্থা হয়েছে। সে যদি পঙ্গু হয়ে যায়। হায়! হায়! করে সে শুধু কাঁদে।

কিন্তু কে শুনে কার কথা? সবাই আনন্দিত মনে চলে গেল যার যার গৃহে। পিছনে স্মৃতি রইল শিকারীদের সাহস ও রোমাঞ্চ এবং নির্দোষ পশুদের আর্তনাদে ভরা দুঃখের ইতিহাস।

----------o----------

জুমিয়ার সংসার

শহর থেকে অনেক দূরে' অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে, অনেক ছড়া পার হয়ে শ্মশানঘাট পাশ কাটিয়ে আরও কিছু দূর এগিয়ে তেঁতুল ও বটতলায় অবস্থিত চাকমা

জুমিয়ে গ্রাম। দু'টি বা তিন'টি ছড়ার মিলিত স্থান দোছড়ি বা তেছড়ি নামক স্থানে চাকমারা আদাম বা পাড়া বাঁধে।

হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিলার উপর গড়িয়ে ছড়াগুলি প্রবাহিত হয় বলে গ্রামটি সব সময় পানির কলরবে মুখর থাকে। এ ছড়াগুলি এলাকাবাসীর প্রাণ। এ ছড়ার কলরবে কেউ শুনে তার মৃত শিশুর কান্না, কেউ শুনে বিরহের জ্বালা এবং কেউ শুনে প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের আকুতি। এ ছড়ার ধারে পাহাড়ের ঢালে নিচে ও ক্ষুদ্র টিলার উপর অনেকগুলি মাচাং ঘর। দেখতে বাবুই পাখির বাসার মত। দু'কামরা বিশিষ্ট যা ঝড় তুফানে দোল খায়। চাকমা বাড়ির খাস কামরার নাম 'শিংকাবা' পরের কামরাটির নাম 'পিজর' পেছনে বেড়ার ঘেরা দেয়া ছোট কামরার নাম 'ওজেলেং' সামনের ঝুলন্ত বারান্দার নাম 'চানা' এবং আরও সামনে খোলা মাচার মত স্থানকে 'ইজর' বলে। এ ছোট বাড়ীতেই চাকমা জুমিয়ার সুখ দুঃখের সংসার।

চাকমা জুমিয়া পুরুষেরা মাথায় খবং (পাগড়ী) ও কার্পাস সূতার তৈরী জামা এবং গামছা পরে। যুবতী মেয়েরা কোমর তাঁতে বোনা নানা ফুল তোলা পিনন ও বুক বাঁধার হাদি পরে। বিবাহিত মেয়েরা কানে ঝুমলী, নাকে নাকফুল, গলায় হাঁসুলী এবং পায়ে রূপার খাড়ু পরে।

সামাজিক পূজা পার্বন, বিবাহ এবং বড়দের নিকট উপহার হিসেবে ধেনোমদ সমাজের আবশ্যকীয় জিনিষ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে তারা সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রোগের জন্য ওঝা বৈদ্যের ভেষজ চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁক, অদৃশ্য শক্তির প্রতি মান্যতা এবং তাদের উদ্দেশ্যে ছড়ার ধারে, ছাতিম গাছের তলে মুরগী, এবং কোন কোন সময় ছাগল ও শুকর বলী দেয়া চাকমা রোগ চিকিৎসার অংগ। এ সমস্ত কাজে মদ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জুম ক্ষেতের নবান্ন উৎসবে বেহুলা বাজিয়ে গেংখুলী, বাঁশী ও খেংগরং বাজিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি প্রেম নিবেদন এবং আবেগ প্রকাশের জন্য উচ্ছ্বাস 'রেইং' ও 'উভগীত' চাকমা সমাজে এখনও বহুল প্রচলিত আছে।

চাকমা পাড়ার মাঝখানে তেঁতুল ও বটতলা সকলের নিকট বহুল পরিচিত স্থান। এ স্থানে গ্রীষ্মের খররৌদ্রের তাপ হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা আশ্রয় নেয়। বিঝু উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা খেলে ঘীলা খেলা, বুড়া-বুড়ীরা সময় কাটায় গল্প গুজবে, শিশুরা খেলে লাটিম খেলা এবং বনের শক্ত লতা গাছের মগডালে পেঁচিয়ে দোলনা টাঙ্গিয়ে দোলে কিশোরের দল।

গ্রামে রাধামন, কালাচান, ধলাচান, বাত্যা, কালচোগা এবং মেয়েদের মধ্যে কালাবি, রাঙাবি, ধণপতি, পরানী, কালাচোগী ইত্যাদি নামের ছেলে-মেয়েরা বাস করে। কেন তাদের জন্ম হল, জন্মের সার্থকতাই বা কি তা তারা বুঝে না, বুঝতেও চায় না। তারাই হল গ্রামের প্রাণস্বরূপ।

প্রত্যেক পাড়ার অন্ততঃ দুই বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন লোকের বসতি থাকে না। মৌজার হেডম্যান পাড়ার সীমানা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, 'অমুক পাহাড় হতে অমুক ছড়া পর্যন্ত তোদের এলাকা'। হেডম্যানের দেয়া এ অধিকারের জোরে এ জায়গায় তারা বংশানুক্রমিক ভাবে জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বৎসরে একবার হেডম্যানকে খাজনা দিলেই চলে। বৈশাখ হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত গ্রামবাসীরা পাহাড়ের জুম ক্ষেতে খামার ঘরে থাকে। কারণ তখন পাহাড়ে পানি পাওয়া যায় এবং বাকী ছয় মাস তারা মূল গ্রামে বাস করে। তখন পাড়া-গ্রাম খুবই সরগরম ও আনন্দে মুখরিত থাকে।

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাহাড়ে জুম কাটা শুরু হয়। ব্যক্তিগত সামর্থ অনুযায়ী তারা জুম কাটার প্রস্তুতি নেয়। জুম কাটার হিসাব করা হয় কত আড়ি ধান (অর্থাৎ দশ সেরে এক আড়ি) চাষ করা হয়েছে সেই হিসাবে। জুম কাটা গাছ, বাঁশ ইত্যাদি তপ্ত রোদে যখন খড়খড়ে লাকড়ির মত শুকায় তখনি পোড়ানোর জন্য আগুন দেয়া হয়। পাড়ার সবাই মিলে সেদিন যার যার জুমে আগুন দেয়।

জুমে আগুন দেয়ার দিন খুবই স্মরণীয় হয়ে থাকে। আগুনের ছোঁয়ায় পাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে ঘুমিয়ে থাকা দৈত্যরা সবাই জেগে উঠে যেন। চারিদিকে কড় কড় শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠে। মুহূর্তে সারা আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সূর্য্যের আলো ম্লান করে দেয়। বাঁশ ফাটানোর সহস্র হাউয়ের শব্দ আকাশে স্ফুলিংগের দীপালি উৎসবে আকাশ যেন লালে লাল হয়ে উঠে।

জুমে আগুন দেয়ার কমপক্ষে দু'দিন পরে জুমে যেতে হয়। ইহাই তাদের প্রচলিত নিয়ম। জুমের আগুন নিভে গেলে আধপোড়া কাঠ, খড়কুটা ইত্যাদি পরিস্কার করে ধান বপনের উপযোগী করে তোলা হয়।

ঋতু পরিবর্তনে এক সময় বৈশাখ মাস আসে। বিধাতার আশীর্বাদ নামে ধরিত্রীর বুকে। দেয়ার গুড় গুড় আওয়াজে বৃষ্টি নামে মুষল ধারে। পাহাড়ে মৃত ঝর্ণাগুলি তখন ফিরে পায় প্রাণ। মাটির ভেজা গন্ধে জুমিয়ার ঘুম তখন আসে না। তার কাজ বেড়ে যায় বহুগুণ। কার্পাস তুলার বীজ মাটিতে মেখে জুমে বপনের উপযোগী করে 'কবরক' বা 'গেলং' ধানে মিশিয়ে কোমরের পিছনে 'কুরুম' বেঁধে

জুমিয়া পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে 'তাগোল' দ্বারা ধান বপন করে। জুমের ধারে জঙ্গলে তখন 'হকলক' পাখি একমনে হুক হুক শব্দে ডেকে উঠে। বনের ধারে জুমের ক্ষেতে চেরেই রেই রেই শব্দে এক প্রকার পোকা সারা এলাকা মুখরিত করে রাখে। জুমে জুম ধানের সাথে আলুর বীজ ও অন্যান্য শাক-সবজীর বীজ পোঁতা হয়। পাহাড়ে জন্মানো মারফা, চিনার ফল, আমিলা কুমড়া ইত্যাদির বীজও বপন করা হয় এ সময়। জুমের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য কেউ কেউ গাঁদা ফুলের বীজও ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন স্থানে।

কিছু দিন পর জুমে বোপীত ফসলের চারা বের হয়ে আসলে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের খরগোশ, হরিণ ইত্যাদি প্রাণীরা খবর নেয়। বনের শুকরও জুম ক্ষেতের ফসলে, আলু ও কচুতে ভাগ বসাতেই আসে। এমনকি বনের বানরও জুমের লাউটা ভুট্টাটা কত বড় হয়েছে তার খবর রাখে। বনের তোতা, ঘুঘু সবাই আশা করে জুম ক্ষেত হতে কিছু পাওয়ার। তাই ক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন জুমের মধ্যে টং ঘর তৈরী করার।

জুমিয়ার এরূপ জীবন জীবিকায় সুখ, দুঃখ ও হাসি-কান্না ভরা তেছড়ি পাড়ায় অন্যান্যদের মত মন কুমারও তার স্ত্রী ফুলমালাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। এক ছেলে কালা চান ও এক মেয়ে ধণপতীকে নিয়ে তাদের সোনার সংসার। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা ছিল কেউ জানে না। এ সংসারে নেমে এল ঝড়। গেল বছর তার স্ত্রী ফুলমালা দু'দিন ডায়রিয়ায় ভোগার পর হঠাৎ মারা গেল। এবার মনকুমার পড়ল জ্বরে। জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। চিকিৎসার জন্য পাড়ার চন্দ্রকান্ত বৈদ্য আসল। ঝাড়-ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র করল, নিজের তৈরী ঔষধ খাওয়াল, শেষে ছড়ার পাড়ে ও ছাতিম গাছের তলে তার রোগ মুক্তির জন্য মুরগী বলী দিল। পাড়ার আত্মীয়-স্বজন এসে সবাই তার রোগ মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবলা ছেলে ও মেয়ে বাবার শয্যা পার্শ্বে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল।

মনকুমারের তখন অন্তিম সময়। রোগশীর্ণ মুখে দীর্ঘশ্বাস টেনে সময়ের অপেক্ষা করছে মাত্র। এক সময়ে সে কম্পিত হাতে ছেলে-মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে অস্পুট স্বরে বলল, 'আমার বাবা, আমার মা, তোদের দেওয়ার মত আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নাই, ঐ তাগোলটা (ধান বপনের ধামা) নে, জুমে কাজ করে খাও গে যা', এই বলে সেদিন মনকুমারও চিরদিনের মত তাদের ছেড়ে চলে গেল।

বাইরে তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের খররোদ। পাহাড়ে তখন এক সুরে 'ন্যায়-ন্যায়' শব্দে ডেকে চলেছে বনের পোকাগুলো।

----------o----------

মুননুয়াম পাড়ায় একদিন

১৯৭৯ইং অক্টোবর মাসের একদিন। মুননুয়াম পাড়া রুমা থানার বম উপজাতির একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। পাহাড়ের চূড়ায় আকাশের নীল শামিয়ানার নীচে ইহার অবস্থান।

দক্ষিণ হতে উত্তরে প্রবাহিত সাংগু নদীর তীর বেয়ে জেলা শহর বান্দরবান হতে সারা রাত্রি নৌকা ঠেলে পার্বত্য থানা রুমাতে যখন যাত্রী নৌকা পৌঁছে পরদিন তখন সকাল ১০.০০টা বাজে। রুমা এলাকার চারিদিকের নিস্তব্ধ পরিবেশ, পাহাড়, খরস্রোতা নদী এবং লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ঢালে নির্মিত সরকারী বাসস্থানগুলো দেখলে মনে এক অব্যক্ত ভাবের উদ্রেক হয়। নবাগত কেউ এলে তার মনে হয় যে, কল্প লোকের কোন অচিন পুরে যেন সে এসে গেছে। চাকরী ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় যাঁরা বদলী হয়ে আসেন তাঁদের মনে হয় যে, কোন সুদূরের বন্দী শিবিরে তিনি যেন বদলী হয়ে এসেছেন।

রুমা থানা কমপ্লেক্স এর উত্তর পূর্ব কোণে ১ কিলোমিটার দূরে সাঙ্গু নদীর তীরে রুমা বাজার। এ বাজারে নানা উপজাতির মিলন মেলা বসে। এখানে নানা ভাষা ভাষীর লোকজন নানান কথা বলে। বিচিত্র তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, দুর্বোধ্য তাদের কথা বার্তা। এখানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে কাছের মানুষ দূরে অবস্থান করে, এক উপজাতি থেকে অন্য উপজাতি।

তাদের চেনার একমাত্র উপায় হলো বেশ-ভূষা ও পোশাক পরিচ্ছদে। কোন কোন উপজাতীয় পুরুষ মাথার সামনে চুলের ঝুটি রাখে। আবার কেউ কেউ মাথার পেছনের ঝুটিতে মোরগের পালক বা রূপার ক্লিপ লাগায়। খুমী উপজাতীয়রা পিছনের দিকে লম্বা নেংটি ঝুলিয়ে রাখে। মুরুং মেয়েরা দাঁতে কালো কস লাগায়। অধিকাংশ মেয়ে গলায় পুঁতির মালা, কানের লতি ভর্তি রূপার চোঙ, গায়ে আঁট সাঁট কাপড় পরে।

অনেকের মুখে লম্বা নল বিশিষ্ট তামাকের ছোট কলকি থাকে, যাকে তারা পানজুক বলে, তাতে অপরিশোধিত কড়া তামাক পুড়ে। বোবা চোখে সবাই তাকায় অপরিচিত কেউ এলে।

সুন্দর প্যান্ট, মাথায় হ্যাট পরা ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা সুন্দর বাংলায় আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁরা হলেন বম উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোক। পোশাক পরিচ্ছদে ও চালচলনে তারা সাহেবী। এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষায় পশ্চাদপদতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলে এ ব্যাপারে তাঁরা সরকারের সহযোগিতা কামনা করবেন। উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা দেয়ার কথাও বলবেন তাঁরা।

বম উপজাতীয় লোকেরা খ্রিষ্টান। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য রুমা বাজারের সন্নিকটে ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি বোর্ডিং আছে। শতাধিক ছেলে-মেয়ে এ বোর্ডিং এ থেকে বিনা খরচে লেখাপড়া করে।

থানা কমপ্লেক্স এর পাশে পলি ছড়ার অপর পারে বেথেল পাড়া। এ পাড়ার বাবু লাল নাথ বম একজন প্রবীণ গ্রাজুয়েট। এ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকেন। জনাব ডাঙ্গা লুসাই রুমা থানা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি এ এলাকায় সর্বজন শ্রদ্ধেয়। জনাব জোলাই মাস্টার একজন কাঠ মিস্ত্রি। এঁরা সবাই সুন্দর জীবন-যাপন করেন।

রুমা সদর হতে ২০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে অবস্থিত মুননুয়াম পাড়া, বাসতলাং পাড়া ও আর্থাপাড়া বম উপজাতী সম্প্রদায়ের পুরাতন ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম হিসাবে পরিচিত। কমলা ও চায়ের বাগান হিসাবেও গ্রামগুলি বিখ্যাত। পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন উপজাতীয় লোকের রুমা বাজারে যাওয়ার সংযোগ রাস্তা ইহার পাশ দিয়ে যাওয়ায় এই গ্রামগুলির গুরুত্ব সমধিক।

জনাব রামথন বম মুননুয়াম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। জনাব ডরবিল কার্বারী এ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজ সেবক এবং বিদ্যালয়ের সভাপতি। বাবু ইন্ডিয়াতন বম একজন ধর্ম প্রচারক। তাঁরা একদিন রুমায় এসে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তাঁদের এলাকা ভ্রমণ করার আহবান জানালে আমি সানন্দে রাজী হই।

অক্টোবর মাসের শেষ পপ্তাহের একদিন। রামথন বাবু সহ আমরা যাত্রা করলাম মুননুয়াম পাড়ার উদ্দেশ্যে। পায়ে চলার রাস্তা, সে এক দুঃসহ ক্লান্তিকর

পথযাত্রা। পাহাড়ী পথের ধারে প্রথমে পড়ল মিনঝিরি পাড়া। মারমা সম্প্রদায় অধ্যুষিত। তেঁতুল ও বটতলায় ছোট ছোট বাড়ী-ঘর গুলি নিতান্তই সাধারণ। মাঝখানে সুদৃশ্য বৌদ্ধ মন্দির। এ মন্দিরে ছোট মারমা ছেলে-মেয়েরা 'কাগ্রি, কাকোয়ে' ইত্যাদি বার্মিশ হরফে সরবে লেখাপড়া করে।

পাহাড়ী বুনো পথের সে একই দৃশ্য। সরীসৃপের মত পথটি এঁকে বেঁকে গেছে দূর কোথাও অজানায়। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড়, ঝরণা। কোথাও আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়া। নিঃসঙ্গ পাহাড়ের ধারে নানা পোকা মাকড়ের বিচিত্র শব্দ। পথে দু'একজন পথচারী। কোথাও পরিত্যক্ত জুমক্ষেত। জুমক্ষেতে ভাঙ্গা খামার ঘর, ডানা ভেঙ্গে পাখি যেন পড়ে আছে। জুম ক্ষেতের ধারে লাল লাল গেঁদা ফুলের সমারোহ দেখতে অপরূপ!

পথে জুটমরম আরও একটি মারমা পাড়া পেরিয়ে আমরা বম উপজতীয় এলাকায় এসে গেলাম। এখানে অধিকতর গভীর জঙ্গল। পথের দু'ধারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বৃক্ষ সকল।

বম সম্প্রদায়ের আদি পেশা জুম চাষ। তাদের পাড়ার চারপাশে তিন চার বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী গভীর বন। বনের গভীরতা অনুসারে জুমের উর্বরতা নির্ণয় করা যায়। পরিবার পিছু প্রতি বছর তারা লটারীর মাধ্যমে জুম এলাকা বন্টন করে। প্রথম বছর উত্তর পার্শ্বে জুম চাষ করলে পরবর্তী বছর গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে চাষ করে। এ ভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং পর্যায়ক্রমে জুম চাষ করায় ছয় সাত বছর পর আবার প্রথম স্থানটি উর্বর হয়ে উঠে।

পাড়ার চারিদিকে জঙ্গল রাখার অপর কারণটি হল পাহাড়ের চূড়ায় বসবাসকারীদের জন্য পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা। গভীর জঙ্গল পানি ধরে রাখে বলে গ্রীষ্মের সময়ও ঝর্ণাগুলি শুকায় না। তাছাড়া এ জঙ্গল তাদের ঘর-বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম যোগায়। পালিত গরু ও গয়াল রাখার জন্যও জঙ্গল প্রয়োজন।

গভীর জঙ্গল পার হতেই দেখা গেল পাহাড়ের চূড়ায় জনবসতি। ইহাই মুননুয়াম পাড়া। শতাধিক পরিবারের লোক বাস করে এ গ্রামে। পাড়ার তিনদিকে গভীর খাদ। পূর্বে স্থল পথে এসে কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারত না, পাড়াটি ছিল সুরক্ষিত।

বাঁশপাতা ও শনের ছাউনীতে তৈরী ঘরগুলি নিতান্তই সাধারণ। গৃহগুলি ঠাসাঠাসি ভাবে নির্মিত। গ্রামের এক পার্শ্বে গীর্জা। আমাদের আগমনে অরণ্য

জনপদে কোলাহল পড়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আগু বাড়িয়ে গেল, কেউ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে, কেউবা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অতিথিদের আগমন দেখল।

সেদিন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত গণ সংযোগের আনুষ্ঠানিক সভায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একে একে সবাই বক্তব্য রাখলেন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যাতে সুন্দর ভাবে চলে সে জন্য তাঁরা নানা প্রস্তাব রাখলেন। মুননুয়াম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যাতে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহযোগিতা লাভের জন্য এসভায় সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে আমরা ফিরে আসলাম পাড়ায়। পাড়ার কার্বারী ডরবিল বমের বাড়ীতে আমার খাবার ও থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মাচাং ঘরের খাস কামরাটি বেশ সুন্দর ও পরিপাটি ভাবে সাজানো। বড় বড় জঙ্গলী কচ্ছপের খোলস, প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত সুন্দর পাথর পাটা এবং হরিণের চামড়া বিছানো হয়েছে বসার জন্য। বেড়ার এক পার্শ্বে বাঘের চামড়া ঝুলানো, অন্যপাশে হেলানো মইয়ে বাঘ, ভালুক, নানা ধরণের জন্তু ও ধনেশ পাখীর কঙ্কাল মাথা থরে থরে সাজানো আছে। এ সমস্ত কঙ্কাল দেখে পরবর্তী পুরুষেরা তাদের পূর্ব পুরুষদের শৌর্যবীর্যের কথা জানতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন।

দুপূরের আহার সমাপ্ত করার পর হাসি ও আনন্দের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বম সম্প্রদায়ের লোকজন বেলা না ডুবতেই খাওয়া দাওয়া সেরে নতুন পোষাক পরিধান করে যুবক যুবতী সবাই হাত ধরাধরি করে আড্ডা দেয়, গীর্জায়ও যায়। বম উপজাতীর ভাষা খুবই মোলায়েম ও শ্রুতি মধুর। রোমান হরফে তাদের ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ বাইবেল তাঁরা সবাই পড়তে পারেন।

সে দিন সন্ধ্যায় ডরবিল কার্বারীর বাড়ীতে লোকজন জমায়েত হতে লাগল। উঠানে পেট্রোমাক্স জ্বালানো হল। গীর্জা হতে নিয়ে এল গীটার, ঢোল এবং নানা বাদ্য বাজনা এবং কি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে বলে মনে হল।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক রামথন বাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, অদ্য রাতে অতিথির আগমন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে 'লালপা' পরম পিতা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রথমে ছোট ছেলে-মেয়েরা মঙ্গলগীতি গাইল। তারপর গীটার বাজিয়ে একক ও দ্বৈতভাবে ঈশ্বরের বন্দনা, প্রেম গীতি এবং যুবক যুবতীরা হাত ধরাধরি করে নানা অঙ্গ ভঙ্গিতে তাদের ভাষায় গান গেয়ে নাচল। সর্বশেষে

ঐহিত্যবাহী বাঁশ নৃত্য 'টাক্ টাক্ ড্রিম ড্রিম' শব্দে বাঁশের উপর বাঁশ ফেলার তালে তালে দুটি মেয়ে বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে নাচতে লাগল। বাঁশ নৃত্য খুবই আকর্ষণীয় ও মজার। তাই এ নাচের তালে তালে সমবেত লোকজন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকে। এ সময় বাদ্যযন্ত্রের কড়া আওয়াজ ও লোকের উচ্ছ্বাস ধ্বনি পার্শ্বের পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সন্ধ্যায় ঘন্টা দু'এক অনুষ্ঠানের পর একে একে সবাই শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন আমার কাছ হতে। ডরবিল কার্বারীর খাস কামরার একপাশে বিছানা দেওয়া হয়েছে আমার শোওয়ার জন্য। আগামী দিনের কর্মসূচী বাচতোলাং ও আর্থাপাড়া যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম। চোখে ঘুম আসে না। সামনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, দূরে কমলা গাছের ঝোপগুলি নিথর নিস্তব্ধ; সেগুলি এখন ফলভারে নত। তার পাশে জোনাক পোকাগুলো ঝিক মিক করছে।

এ ভাবে নানা ভাবনায় আস্তে আস্তে রাত বেড়ে যেতেই পাড়ার লোকজনের কোলাহল একসময় স্তব্ধ হয়ে এল। বনতল নিঝুম পাহাড়ী গ্রামে শান্তি নেমে এল। হেমন্তের ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলি ডেকে উঠল এক টানা, ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ। উঁচু গাছের মগডালে সে রাত জাগা পেঁচকটিও ডেকে উঠল সেদিন, 'মোক পো কদরক, মোক পো কদরক'।

----------o----------

ডরোথি

জানালার ধারে রোগ শয্যায় রোগ যন্ত্রণা নিয়ে বসে আছি। দক্ষিণের ফুর ফুরে হাওয়া হু হু করে সামনের বকুল গাছের ফুল ঝরিয়ে প্রবেশ করছে খোলা জানালা দিয়ে। সামনের টানা বারান্দা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বারান্দা পার হয়ে খোলা মাঠ। মাঠ পেরিয়ে এক মেঠো পথ কোথায় জানি চলে গেছে। বারান্দার সামনে জুবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়াটি ন্যাড়া মাথায়। বসন্তের আগমনে ফুল ফুটবে এই অবস্থায়।

কবে জানি ছুটি হবে। আমার রোগ আরোগ্য হবে। পাহাড়ী দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ছড়াছড়ির ধারে আমাদের সে ছোট গ্রামখানী; যেখানে আমার বাবা ও মা আমার ভাই-বোনদের নিয়ে স্বর্গীয় আনন্দে বাস করেন সেখানে কবে ফিরে যেতে পারব। দক্ষিণের আকাশে তখন পেঁজা পেঁজা তুলার মত মেঘ করেছে; এখনি বুঝি ঝড় হবে!

'কি খোকা, কেমন আছ?' শুদ্ধ বাংলায় শুভ্রবেশধারী এক মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন। মুখে তাঁর স্বর্গীয় দীপ্তি, পবিত্রতায় যেন তা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। কি কমনীয়, কি আশা ভরা মুখ তাঁর। মুখে হাসি চোখে আশার ইঙ্গিত। মনে হয় যেন স্বর্গীয় কোন দুতি মর্ত্যে নেমে এসেছেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি শান্ত স্বরে আবার বললেন, 'খোকা', মায়ের কথা মনে পড়েছে বুঝি?

সান্ত্বনা দিয়ে তিনি আবার বললেন, 'চিন্তা করো না, তোমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে। তারপর তুমি চলে যাবে তোমার মায়ের কাছে।' তিনি আমার শরীরের তাপ, ঔষধপত্র এবং আমার আহতস্থান পরীক্ষা করে চলে গেলেন।

চলে যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমি আবার আসব, তুমি কোন চিন্তা করো না, কেমন?'

চন্দ্রঘোনা ব্যাপ্টিস্ট মিশন হাসপাতাল কর্ণফুলীর ধারে মানব সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। যে সময় এ চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমস্ত পাহাড়ী এলাকার জনগণের রোগ হতে আরোগ্য লাভ ছিল ভাগ্যের উপর সমর্পিত।

আর্তমানবতার সেবাই ছিল এই মিশন হাসপাতালের মূল উদ্দেশ্য। সমাজের যারা ছিল অপাঙক্তেয়; ঘৃণিত কুষ্ঠরোগী এবং মুমূর্ষু অবস্থায় যে সব রোগীকে আনা হত তাদের সেবা করা হয় আপনার ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ দিয়ে, বৃদ্ধকে পুত্ররূপ দিয়ে, ভাই-বোনকে ভাই বোনের রূপ, ছোট ছেলে-মেয়েকে মাতৃরূপ ধারণ করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ডাক্তার ও নার্সগণ সেবা করেন নিরলসভাবে রোগীদের। সেবার দ্বারা রোগীর মুক্তি তাঁদের কাছে পরম প্রাপ্য। বহুদূর দূরান্ত থেকে রোগীরা আসে। রানখিয়াং, কর্ণফুলী, চেঙ্গী ও কাচলং নদীর দুর্গম অঞ্চল হতেও ঝাড়ফুঁক ভেষজ চিকিৎসায় আরোগ্য না হয়ে সর্বশেষ অবস্থায় রোগী নিয়ে আসে। হাসপাতাল উপজাতীয় লোকের জন্য ছিল ভয়ের স্থান। এখানে দেওয়া হয় ইনজেকশন, মানুষের শরীর কাটা হয়, এখানে লোক মারা যায়। তাই ইহা ভুত প্রেতের আড্ডা খানা হিসাবে তারা মনে করে। ইনজেকশন দেওয়ার সময় তারা ভয়ে চোখ বন্ধ করে রাখে।

এ হাসপাতালে আসলে রোগ আরোগ্য হয়। এখানে আসার সময় লঞ্চে চড়া যায়। কর্ণফুলী নদীর বিশালত্ব দেখে পাহাড়ী লোক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়! নানা পেশার লোক, নৌকা, সাম্পান ইত্যাদি দেখে আনন্দ লাভ করা যায়। কর্ণফুলীর তীরে চীৎমরমের সুদৃশ্য বৌদ্ধ মন্দির দেখে উপজাতীয় বৌদ্ধরা মোহিত হয়। তাই যারা রোগের একবার উপশম লাভ করে বাড়ি ফিরে তাদের মুখে গল্পের খৈ ফুটে।

নিত্যদিনের মতো হাসপাতাল এলাকায়ও সূর্য ডুবে; পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে। হাসপাতালের লাল দেওয়ালে ডুবন্ত সূর্যের আভা সঞ্চারিত হয়ে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। তারপর লাল সূর্য ক্রমে ছাদ এবং সর্বশেষে পাহাড়ের উপর নির্মিত গীর্জার চূড়ায় শেষ আভা ছড়িয়ে রাতের বিশ্রামে যায়। সারা পৃথিবীতে যেন প্রশান্তি নেমে আসে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাতের প্রহরীরা তখন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ হারিকেন জ্বালানো হয় রোগীর ঘরে ঘরে। ক্লান্তি নেমে আসে রোগীর চোখে মুখে। ব্যস্ততা বেড়ে যায় ডাক্তার ও নার্সদের। রোগীর খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির কাজে।

যে কামরায় আমি রোগী হয়ে থাকি তা ছিল একটি প্রাইভেট কক্ষ, মহিলা ওয়ার্ড। পাশাপাশি ছিল দু'টি সীট। পেছনে ছিল রান্নাঘর ও বাথরুম। সামনের মাঠে ছিল একটি নলকূপ, তা হতে অনবরত পানি গড়িয়ে পড়ত। লোকজন সেখানে গিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে যেত।

সকালবেলা একদিন জানালা খুলে বারান্দায় সূর্যের লুকোচুরি খেলা দেখছিলাম। ডাক্তারদের দেওয়া ঔষধে রোগের যন্ত্রণাটাও কিছুটা কমেছে। রোগশয্যায় বসে আপন মনে কি যেন ভাবছি। ছোট শিশুর ভাবনা তেমন কিছুই না।

এমন সময় সে মহিলা নার্সটি এসে দাঁড়ালেন পার্শ্বে। মুখে তাঁর এক গাল হাসি। মনে হয় যেন জগতে তাঁর কোন দুঃখ নেই। তিনি হাসিমুখে আমাকে আদর করে বললেন, 'তুমি তো ভাল হয়ে গেছ', আর চিন্তা কি?

আমি একজন উপজাতি শিশু হিসাবে বাংলা বুঝতে না পারায় কৌতুহলী হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমার নিজ ভাষার কাছাকাছি আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। উপহার হিসাবে তিনি দিলেন একখানা ছবির বড় এলবাম। এ এলবামে পোকা-মাকড়, জন্তু-জানোয়ার ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের নানা রঙের ছবি ছিল। তিনি আমাকে মাতৃস্নেহে আদর করে আমার সাথে ঘনিষ্ট হতে চান। বয়সে তিনি ছিলেন যুবতী। নাম ছিল তাঁর ডরোথি। তিনি খুবই সুন্দরী। কোন্ জাতির তিনি খৃষ্টান তা জানি না। চেহারায় তিনি বাঙ্গালী। বাংলা ভাষা তাঁর মুখে এত মধুর ভাবে উচ্চারিত হয় যে, তিনি কথা বললে শুধু শুনতেই ইচ্ছা করে।

খৃষ্টান হাসপাতাল। এখানকার ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষা জানা ও শেখার জন্য কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশ ছিল। চাকমা, মগ, বোম, পাংকো, মুরুং, খুমী, খ্যাং এ সমস্ত উপজাতীর মানব আচরণ সম্বন্ধেও তাঁরা ছিলেন ওয়াকেফহাল। এ জন্য মনে করা হতো এ মিশন হাসপাতাল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এখানে চিকিৎসা করে কেউ মারা গেলে মনে কোন খেদ থাকত না। এ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষও চায় মানুষ ঈশ্বরের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করুক।

আমার দেখাশোনা ও শুশ্রূষার ভার ছিল মিস্ ডরোথির উপর। তিনি সকাল-বিকাল আসতেন, গায়ের তাপ পরীক্ষা করতেন, ঔষধপত্র দিতেন এবং মাঝে মাঝে ঠেলাগাড়ীতে করে প্রধান হাসপাতালের চিকিৎসা কক্ষে নিয়ে আমার পায়ের আহত স্থান ধুয়ে দিতেন। পরিস্কার ধব ধবে কাপড়ে ব্যান্ডেজ করে গল্প করতে করতে আবার রোগ শয্যায় তিনি আমাকে তুলে দিয়ে যেতেন। আমার বাবা ছিলেন খুবই সরল। তিনি আমার সঙ্গেই থাকতেন। প্রথম প্রথম এখানে এসে তিনি আমার চোখের আড়াল হলেই আমি কেঁদে উঠতাম। আমার বয়স ছিল তখন তিন কি চার বৎসর। কেমন জানি ভরসা পেতাম না কারো উপর ভরসা করে। মিস্ ডরোথি যখন আমাকে শুশ্রূষা করতে আসেন বাবা তখন পাশে থাকেন। শেষে ডরোথি যখন আমার সাথে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশার চেষ্টা করেন বাবা তখন একটু দূরে থাকার চেষ্টা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি যেন ক্রমেই স্বাভাবিক হই।

মিস্ ডরোথি সে দিন প্রধান হাসপাতাল থেকে ঠেলাগাড়ীতে করে নিয়ে এসে আমাকে বারান্দায় রাখলেন। তিনি ঐ দূরের প্রকৃতির দিকে ঈশারা করে বললেন, কেমন দেখছো, খোকা?

বাহিরে তখন বসন্ত। দূরে শিমুল গাছে লাল লাল ফুল। বকুল তলায়ও অজস্র ফুল পড়ে সাদা হয়ে আছে প্রাঙ্গন। পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটি থোকায় থোকায় মঞ্জুরিত হয়ে বাতাসে দুলছে। মিস্ ডরোথি ঘনিষ্ট হতে হতে আমার অনেক কাছে এসেছেন। আমি আর তাঁর সাথে আলাপে ভয় বা সংকোচ বোধ করতাম না। প্রত্যহ তিনি রুটিন মাফিক সকালে আসতেন এবং আসার সময় কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসতেন।

এ জন্য আমার বাবা তাঁর নিকট খুবই লজ্জাবোধ করতেন। ডরোথি নিজের সম্পর্কে কিছুই বলতেন না। কিন্তু আমার নিকট হতে তিনি অনেক কিছু জানতে চাইতেন। যেমন আমার বাড়ি কোথায়, আমরা কত ভাই-বোন, আমি কেন হাসপাতালে আসলাম ইত্যাদি, ইত্যাদি। মাতৃবৎ এ মহিলার সাথে অসম্পূর্ন ভাষায়

আমি কথা বলতাম। আর তিনি তা নিজে বুঝে নিয়ে সুন্দরভাবে নিজের ভাষায় সাজিয়ে নিতেন।

আমার বাড়ী ছিল রানখিয়াং নদীর ধারে বহু দূরে। পাহাড়ের ধারে যেখানে শারদীয় কাশফুল বাতাসের দোলায় রাজ সিংহাসনে বসা রাজাকে যেন চামর দোলায়। চারিদিক শুধু পাহাড় ঘন সবুজ গাছ-গাছালি আর ঝুম ঝুম ঝরণা। এ ঝরণার ধারে কোন সময় বুনো হরিণ নেচে বেড়ায়। কখনও বুনো মোরগগুলি দলবেঁধে পানি খেতে আসে। সরীসৃপের মত পাহাড়ী রাস্তাটি গ্রামে পৌঁছে আবার কোথা যেন হারিয়ে যায়।

বনে নিঃসঙ্গ এলাকায় মানুষের বসতি। কোন কোন পাড়ায় ৫০-৬০ পরিবারের মতোলোক বাস করে। তারা মূল গ্রামে থাকে বছরে ছয় মাস। আর অন্য ছয় মাস থাকে নিজ নিজ জুম ক্ষেতে। সকল লোক মাচাং ঘরে বাস করে অত্যন্ত সাদাসিধে অবস্থায়। মাচাং ঘর দুই তিন কামরার মত হয়। রাতের বেলা পাড়ায় বাঁশীর সুর বাজে; নীরব চাঁদটা আলো দেয় সারা পাহাড় জুড়ে। বনের পেঁচকগুলো ডেকে ডেকে আমাদের ঘুম পাড়ায়।

গ্রামের লোকজন খুবই গরীব। তবে সবাই জুমের ফসল ভাগা-ভাগী করে খায় অভাবের দিনে। শিশুদের পাহাড়ে উঠা, গাছে চড়া জন্মগত অভ্যাস। অসুখের সময় চিকিৎসা হয় ওঝা বৈদ্যের ঝাড়ফুঁক মন্ত্রে, ভুত দেবতার উদ্দেশ্যে ছড়ার ধারে, বড় গাছের নীচে শুকর, ছাগল ও মোরগ বলি দেয়া হয়। ইহাতে ভাল না হলে চীৎমরম বিহারে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে মানস করা হয়। যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা হাসপাতালে চলে যায়।

আমরা যে কামরায় থাকতাম তার পাশাপাশি আরও অনেক কক্ষ আছে। সেখানেও রোগীরা থাকে।

হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বার্টন যাঁকে চাকমারা "বদন" সাহেব বলে ডাকে তিনি মাঝে মধ্যে এলাকা পরিদর্শন করে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, রোগীর চিকিৎসা ও অগ্রগতি দেখে যেতেন। ক্ষুদ্র দেহী চাকমার তুলনায় লম্বা চওড়ায় অস্বাভাবিক বৃহত্তম দেহধারী লোকটা মাথায় হ্যাট, মুখে বর্মী চুরুট, পরণে হাফ-প্যান্ট, পায়ে বুট পরে যখন আসতেন তখন মনে হতো যেন সারা প্রাঙ্গণ গম গম করে উঠছে। তখন ডাক্তার ও নার্সরা ছুটাছুটি করতেন কর্ম ব্যস্ততায়।

তিনি আমার জানালার পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। লোকটা শারীরিক গঠনে বৃহত্তম হলেও মনের দিক দিয়ে খুবই সহজ ও সরল। বিশেষ করে প্রথম হাসপাতালে আমার আসার সময় এবং পরে পায়ের ক্ষতস্থান অপারেশনের সময়

তাঁকে দেখেছি। ইংরেজী ভাষা আমাদের কেউ বুঝত না ও জানত না। তাই তিনি সাহেবী ভাষায় বাংলা উচ্চারণ করে আকারে ইঙ্গিতে আমার বাবাকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। "টুমি কোন চিন্তা করো না, তোমার ছেলে ভাল হইয়া গেছে"।

আমার বাবা হাঁ হাঁ করে সায় দিতেন। আমার শুশ্রূষাকারিনী মিস্ ডরোথি বাবাকে সাহেবের কথা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি বললেন যে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে ডিসচার্জ করা হবে।

আমিও নিজেই বুঝতে পারছি যে, আগের চেয়ে আমি ভাল হয়ে গেছি। আমার বাবা রোগীর সীট থেকে নামিয়ে আমাকে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়ে দিতেন। ক্রমে বসন্তের মৌসুম কেটে গ্রীষ্ম এসে গেল। দু'এক ঝাপটা কালবৈশাখীর মাতম হাওয়া বয়ে গেল টিনের চালের উপর দিয়ে খর খর করে। সামনের কৃষ্ণ চূড়াটি এবার ফুলভারে নত হল। দমকা হাওয়ায় লাল লাল পাপড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারিদিকে।

ডাঃ বার্টন সাহেব এসে সেদিন আমার শরীরের সব কিছু পরীক্ষা করে এক গাল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে হাঁ হাঁ করে হেসে উঠলেন। তারপর বাবাকে বললেন, "কাল তোমার ছেলের ছুটি, যেমন বলছে ঔষধ দিও, কেমন"। আবার হাঁ হাঁ করে হেসে উঠলেন তিনি। তারপর বললেন, ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। এ কথা বলে আমার গালে টোকা দিয়ে মাথার হ্যাট নামিয়ে বললেন, "গুড ইভিনিং"। বাবার সাথে হাত মিলিয়ে তিনি চলে গেলেন, বিদায় .....। বাবা ও আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে সেই মহাত্মার প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানালাম।

পরদিন সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম হতে রাঙ্গামাটির লঞ্চ আসবে। তাই সকাল সকাল আমার বাবা গোছ-গাছ করে নিচ্ছেন। এমন আর কি জিনিষপত্র। দু'একটি হাঁড়ি পাতিল, বাসন-কোসন আর ছোট একটি ট্রাংক।

এমন সময় মিস্ ডরোথি এসে হাজির। হাতে তাঁর এক গুচ্ছ ফুল। মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। তিনি সুন্দর বাংলায় বললেন, ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। কত সুন্দর এই পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমার বাবার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনার ছেলেকে লেখাপড়া শিখাবেন, কেমন? তারপর আমাকে গুচ্ছফুলটি দিয়ে কতইনা আদর করলেন। মাতৃস্নেহে যেন তাঁর হৃদয় মন্দির বেজে উঠেছে গভীর ভাবে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিস্ ডরোথির কপোল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।

আমার বাবা সহজ সরল ভাষায় কথা বলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তাঁর জানা নেই। তাই শার্টের পকেট হতে তিনি চক চকে পাঁচটি রূপার মুদ্রা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আমিতো গরীব, দিবার মত আমার কিছুই নাই।"

মুহূর্তে সাপ দেখার মত মিস্ ডরোথি লাফিয়ে উঠলেন,"না না এগুলো নেওয়া যাবে না। ঈশ্বরের রাজত্বে সেবাই আমাদের প্রধান ধর্ম, রোগীর আরোগ্য লাভ আমাদের পরম পাওনা।"

মিস্ ডরোথি আর স্থির থাকতে পারলেন না। হাত তুলে বিদায় জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

----------o----------

পক্ষীমূড়া ধোপানীঘাট

রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের ধারে মহালছড়ি থানার মানচিত্রের আকার দেখতে কতকটা গামবুটের মত; উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পশ্চিমে কিঞ্চিৎ বাঁকা। খরস্রোতা চেঙ্গী নদী, জালের মত বিস্তৃত ছড়া-ছড়ি, ধানক্ষেত এবং প্রকৃতির বুকে সাজানো অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড়। এইতো মহালছড়ি। এখানে যুগ যুগ ধরে জুম ও জমি চাষ করে সুখ শান্তিতে বসবাস করে আসছে চাকমা, ত্রিপুরা, ও মারমা উপজাতি হাতে হাত ধরে।

মহালছড়ি সদর হতে পশ্চিমে পাহাড়ের বুক চিরে যে রাস্তাটি খাগড়াছড়ি-চট্রগ্রাম সড়কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে তা হলো জালিয়াপাড়া সড়ক। এককালের দুর্গম সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন বর্তমানে এ সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় ইহা আজ উন্নয়নের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষমান রয়েছে। মহালছড়ি থানায় দুর্গম স্থান বলতে এখন আর কোন স্থান নেই।

মহালছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত পক্ষীমুড়া। এই থানার সর্বোচ্চ পাহাড়। চির সবুজ বনানীতে এ পাহাড় ঢাকা থাকে সারা বছর। এককালে এ পাহাড়ে বাস করতো বাঘ, ভাল্লুক ও নানা হিংস্র প্রাণী। পাহাড়ের শিলাময় গভীর গর্তে বাস করতো 'রং রাং' নামে এক প্রকার বৃহৎ পক্ষী। এই পাখিগুলি উড়ার সময় তাদের পাখার আওয়াজ শুনা যেত বহু দূর থেকে। তাদের ছিঁ ছিঁ শব্দে মুখরিত থাকতো সারা বনাঞ্চল। সমুদ্র সমতল হতে প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত এ পাহাড়ে উৎপত্তি হয়েছে নাম না জানা নানা ছড়া। শিলাময় এ পাহাড়ের টিপ টিপ

ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরা জল ক্রমে ঝরণা হয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে অনন্তকাল ধরে। চঞ্চল এ ঝর্ণা ক্রমে চুপিসাড়ে কেতকী ফুলের কাছ দিয়ে কাশ বনের ধার দিয়ে কুলু কুলু রবে বৃহৎ শিলার উপর গড়িয়ে পড়ছে।

বৎসরের সারাটা সময় পক্ষীমুড়ার পরিবর্তন লক্ষনীয়। বর্ষায় ইহা প্রায় সময় মেঘে থাকে ঢাকা। শরতে পাহাড়ের ধাপে ধাপে কুয়াশা এবং পাহাড়ের চূড়ায় ঝলমলে রোদ। আকাশের মেঘগুলি পাহাড়ের ধাপে ধাপে খেলে রৌদ্র ছায়ার খেলা। পাহাড়ের ধাপে জুম ক্ষেত গুলি দূর হতে দেখায় বিছানো চাটাইয়ের মত। ভাদ্র মাসে পাকাধানের মৌসুমে জুমিয়ারা টং ঘরে অতিথি অভ্যর্থনা জানায় সুঘ্রাণযুক্ত 'কবরক' চালের ভাত ও বুনো মোরগের মাংসে এবং আরও ঘনিষ্টজন হলে ধেনো মদ পানে।

পক্ষীমূড়ায় উৎপন্ন হয়ে ধোপানী ছড়া এগিয়েছে সামনে। মহালছড়ি সদর হতে মহালছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়কের চার কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলে যৌথ খামার পাহাড়ী গ্রাম। এ গ্রামের পাশ দিয়ে সিঁড়ির মত আঁকা বাঁকা পথটি উঠে গেছে পাহাড়ের অনেক উপরে। এ পথ ধরে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে ধোপানীঘাট গ্রাম। গ্রামটি ত্রিপুরা উপজাতি অধ্যুষিত। পাহাড়ের নীচে, ধোপানী ছড়ার ধারে টিলার উপর নির্মিত ছোট ছোট বাসগৃহগুলি নিতান্তই সাধারণ। সড়কের পাশ থেকে অনেক উপরে পাহাড়ের চূড়া, ঘন গাছ ও বাঁশবনে ঢাকা এবং তাতে বিরাট বিরাট পাথরের চাতার। বনে নানা পাখির কিচিরমিচির এবং কি যেন একটা পোকার 'ন্যায়-ন্যায়' শব্দ শোনা যায় একটানা। প্রকৃতি যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য বিলিয়ে এখানে নিথর হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সৌভাগ্যবান হলে এ পথে চলতে চলতে পাহাড়ের নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ কখনও হরিণের ডাক শোনা গেলেও যেতে পারে। মনোহারিণী পাহাড়ের এ রূপ যে একবার দেখেছে সে আর কখনও ভুলতে পারে না।

এ স্থানের সু-উচ্চ পাহাড়গুলির শিরা ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। ছোট পাহাড়গুলি যে যে আকৃতির কল্পনা করে সে সেই আকৃতির দেখতে পায়। কোন পাহাড় কচ্ছপের পিঠের মত, কোন কোনটা হাতির মাথা ও শুঁড়ের মত, দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার মত এবং কোন কোনটাকে লম্বা সাপের মতো দেখায়। পাথরের মধ্যেও কোন কোনটা জন্তু-জানোয়ার আকৃতির দেব দেবীর মুর্তির মত। একটা পাথর যা দেখতে অবিকল ব্যাঙের মত। তাকে মারমারা বলে 'ফারু'। অনেক

পাহাড়ী বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির আদি হতে দেবতারা এ সকল পাথর ও পাহাড়ের রূপ ধরে আছে আজও।

পক্ষীমুড়ায় প্রতি পাহাড় ও শিলাময় চাতার হতে এক একটি ছড়া উৎপন্ন হয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে অন্য ছড়ার সাথে এক হয়ে জলের স্রোত আরও বড় হয়ে সামনের দিকে এগিয়েছে। ছড়ার ধারে ধারে বিশালাকার পাথর খন্ড পড়ে থাকে বহুকাল থেকে। উহার পাশ দিয়ে কাতুকুতি খেলা খেলে ঝরণা লাফিয়ে পড়ছে তিন হতে পাঁচ মিটার উচ্চতা হতে। এ ভাবে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে ধোপানী ছড়াটি ক্রমে এসে পড়েছে এক বিশাল আকারের শিলাময় চাতারে। চাতারটি দৈর্ঘ্যে ৩০ মিটার, প্রস্থে ২৫ মিটার এবং উচ্চতায় ১০ মিটার হবে বলে অনুমান করা যায়। ইহা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে ৩টি ছড়ার মোহনায় মিলিত হয়েছে। এখানে সহস্রধারায় তিনদিক হতে পানি গড়িয়ে পড়ে। বর্ষাকালে শিলাময় চাতারে জলের স্রোতের টানে সব সময় ঝক-ঝক, কল-কল শব্দ হয়। পাথরের ধাক্কায় জলে অসংখ্য ফেনা উঠে। ধোপার কাপড় ধোয়া পিঁড়ির মত লাগে সেই দৃশ্য। প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট এরূপ অপরূপ স্থান কোথাও দেখা যায় না। মারমারা এর নাম দিয়েছে 'কোয়া সে কিয়াক পিয়ই' অর্থাৎ জলপরীদের কাপড় ধোয়ার পিঁড়ি।

পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাহাড় হতে ৩টি ছড়া এখানে এসে মিলিত হওয়ায় সনাতনপন্থী হিন্দুরা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল কল্পনা করে এই স্থানের নাম দিয়েছেন ত্রিবেণী তীর্থ। প্রতি বছরের ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখে পূণ্যার্থীরা স্নান করতে আসেন এই পাহাড়ী তীর্থে। ত্রিবেণী সংগম স্থলে একটি অগভীর জলাশয় দেখা যায়। এ জলাশয়ের চারি পার্শ্বে ত্রিপুরা ও অন্যান্য উপজাতিরা পূজা দিয়ে মানস পরিপূর্ণ করেন। উহার অনতিদূরে এক পাহাড়ের শিলাময় গর্তে বাস করে অসংখ্য বাদুড়।

এ স্থানের সবচেয়ে বেশী আশ্চার্য্য স্থান হল ত্রিবেণীর সংগমস্থলে বুদ বুদ দর্শন। হাত তালি দেওয়ার সাথে সাথে অসংখ্য বুদ বুদ মাটির নীচ থেকে উত্থিত হয় এই স্থানে। বুদ বুদে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো মাত্র ধক ধক করে আগুন জ্বলতে থাকে কিছুক্ষণ।

ফাল্গুনের শেষ দিনে পূণ্যার্থীদের সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠে এ নীরব গিরি প্রান্তর। মহালছড়ি সদর হতে ৫ কিলোমিটার দূরে সেই ধোপানী ঘাট, পাহাড়ী উচুঁ সড়কের ধারে একটি বিশালাকার বটবৃক্ষ যা তখন পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে পথচারিদের ছায়া দান করে। তারই পার্শ্বে সরকারী রিজার্ভ ফরেস্টের সেগুন

বাগিচা। সেগুন বাগিচার ভিতর দিয়ে সরু রাস্তাটি শিলাময় সিঁড়ি পেরিয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে অনেক দূরে ধোপানীঘাট পর্যন্ত।

এখানকার নীরব রাস্তা, অরণ্য বন্য পশু-পাখির আবাসস্থল পেরুতে কেমন যেন গা ছম-ছম করে উঠে। চৈত্র মাসে পাহাড়ে ঠা-ঠা রোদ। চারিদিক জুম পোড়ানোর ধোঁয়ায় উত্তপ্ত পরিবেশ। পাহাড়ে ছড়াছড়ি যায় তখন শুকিয়ে। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও ধোপানী ঘাটের জল কখনও শুকায় না, ফলগু ধারার মত পৃথিবীর নিম্নভাগ হতে উত্থিত হয় জল পাপীদের পাপ মোচন করার জন্য। কাহাকেও কার্পণ্য করে না এই পবিত্র জল। শিলাময় চাতারে স্থানে স্থানে ছোট ছোট গর্ত, তাতে ভর্তি হয় মৃদু ধারায় জল। পূণ্যার্থীরা নারী-পুরুষ সুশৃঙ্খল ভাবে সবাই ডুব দিয়ে স্নান করে তাতে।

সেদিন এক সময়ে ব্রাহ্মণের পুতমন্ত্রে মন্ত্রিত হয় পরিবেশ। কেমন যেন ভাল লাগা, পূণ্যময় ও আনন্দঘন এ পরিবেশ। বৃহদাকার শিলাময় চাতারে, বনের ধারে, ছায়াময় বৃক্ষের নীচে অবস্থান করে পূণ্যার্থীরা এক সময় পূজা সারা করেন। ত্রিবেণীর তীর্থ ধুপ, ধুনা, পূজা উপাচারে ও মোমবাতিতে ভরে উঠে। মানুষের কোলাহল, ঢাকঢোল ও মাইকের শব্দে ত্রিবেণীর জলাশয়ে অজস্র বুদ বুদ উঠতে থাকে; যেন এক একটি ফুল হয়ে।

সন্ধ্যার আগেই সেখানে পশ্চিম পাহাড়ের দীর্ঘ ছায়া পড়ে অন্য পাহাড়ে। সূর্যাস্তের আগেই নেমে আসে সাঁঝ সাঁঝ ভাব। অরণ্যের নীরবতা নেমে আসে পরিবেশে। একদিনের মেলা শেষে সবাই ঘরে ফিরেন। তাঁদের মনে গভীর আনন্দ, তৃপ্তির হাসি। ভক্তি গদগদ স্বরে পূণ্যার্থীরা উচ্চারণ করেন 'জয় বাবা ভগীরথের জয়'।

----------o----------

হবিগঞ্জের দিনগুলি

দিনটি ছিল ৫ই মার্চ ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

বান্দরবান হতে বদলী হয়ে নতুন কর্মস্থল হবিগঞ্জ যখন পৌছি তখন বিকাল ৩টা। সিলেটগামী পাহাড়িকা আন্তঃনগর ট্রেনটি নামিয়ে দিল আমায় শায়েস্ত াগঞ্জ স্টেশানে। ৩মিনিট বিরতির পর ট্রেনটি চলে গেল আপন গন্তব্যস্থলে।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর কোলাহল মুখরিত স্থানটি আবার শান্ত হয়ে এল। হবিগঞ্জ শহরটি এখান হতে ১৪ কিলোমিটার দূরে; ম্যাক্সি বা বাসযোগে যে কোন সময় যাওয়া যায়। শায়েস্তাগঞ্জ আমার পূর্ব পরিচিত স্থান। ইতোপূর্বে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা হতে রাঙ্গামাটি জেলার নানীয়ারচরে বদলী হয়ে যাওয়ার সময় এ শায়েস্তাগঞ্জেই আমাদের ট্রেন যাত্রা বিরতি হয়েছিল। শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনের পিছনের রাস্তা দিয়ে তখন পরিবারের সদস্যগণ সহ রিক্সা যোগে গিয়ে আমরা কুমিল্লাগামী বাসে উঠেছিলাম। সে ১৮ বছরের আগের কথা। স্টেশানটির অবস্থা কিন্তু এখনো সেরূপই আছে। স্টেশানের পিছনে গলি। এ গলিতে হরেক রকমের দোকান আছে। দোকানে নানা জিনিষপত্র ঝলমল করে। মফঃস্বল লোকদের জন্য খাওয়ার হোটেলও আছে।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি ম্যাক্সি যোগে হবিগঞ্জ শহরে গেলাম। হবিগঞ্জ শহরের পি.টি.আই. রোড সকলের পরিচিত। এ পি.টি.আই. এলাকায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস অবস্থিত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যখন পৌছি তখন বিকাল ৪টা। পরিচিতি পর্বেই সবাই সাদর সম্ভাষণ জানালেন আমাকে। পি.টি.আই. সুপারিনটেনডেন্ট জনাব সিরাজ উল্ল্যা যিনি কিছুদিন পূর্ব হতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন, তিনিও আমাকে দেখে উল্লাসিত হলেন।

হবিগঞ্জের বিখ্যাত শবরি কলা এবং সুঘ্রাণ যুক্ত চায়ে আপ্যায়িত হলাম। অফিসে এসে এ কথা সে কথার পর সন্ধ্যা হয়ে এল। ইতোমধ্যে অফিসের উপরের তলায় রেস্ট হাউসে আমার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হল। অফিসের জরুরী কাজ সেরে সবাইয়ের কাছ হতে বিদায় নিতেই প্রায় রাত্রি ৭টা বেজে গেল।

অমাবশ্যার রাত। অফিসের পাশে বড় বড় রেইন ট্রি ও সেগুন গাছ চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে। দোতালার বারান্দায় পা দিতেই এক ঝলক বসন্তের হাওয়া

আমার গায়ে এসে লাগল। অফিসের সামনে পূর্ব পশ্চিমে একটি মেঠো পথ চলে গেছে সোজা গ্রামাঞ্চলে। এ পথের ধারে সাজানো হয়েছে সেদিন টিউব লাইট ও নানা রঙ-বেরঙের আলোক মালা। ইহার পশ্চিমে একস্থানে শামিয়ানার নীচে আরও আলো ঝলমল স্থান। সেখানে চলেছে কীর্তন। মনে হলো হিন্দু পর্ব উপলক্ষে কোন গৃহস্থ লোক ঘরে কীর্তনের আয়োজন করেছেন। সারারাত্রি লোকের আনাগোনা চলেছে। ভোর বেলায়ও অনেককেই এ উৎসবে যোগ দিতে দেখলাম।

কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি উৎসব চলছে? এক পথচারী বললেন, হবিগঞ্জের মহাশ্মশানে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে প্রতি বছর যে উৎসবের আয়োজন করা হয় এই সে উৎসব।

শ্মশানের কথা স্মরণ হতেই মুহূর্তে গা ছম ছম করে উঠল। তাহলে আমাদের অফিসের অনতিদূরেই হিন্দু মহাশ্মশান!

হবিগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসটি পি.টি.আই. রোডের ধারে দ্বিতল ভবন। ইহারই পাশে নির্মীয়মান অফিসের গোডাউন, সুদৃশ্য ও সুন্দর।

অফিসের কর্মকর্তা সহকারী মনিটরিং অফিসার বাবু ভূপাল কান্তি দত্ত। উচ্চমান সহকারী মিঃ জামান, ক্যাশিয়ার জনাব আবুল বাসার, অফিস সহকারী আব্দুল হক, আব্দুল বারী ও মাহফুজা এবং কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ও এম.এল.এস.এস. জুলফু মিয়া অফিস পরিচালনায় সুদক্ষ। তাঁরা অত্যন্ত বিনীত স্বভাবের লোক ছিলেন। কর্মতৎপরতায় তাঁরা ছিলেন সদা ব্যস্ত। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জীপ গাড়িটিও কর্ম ব্যস্ততায় থাকে সর্বক্ষণ।

কর্মব্যস্ততার মধ্যে দেখতে দেখতে শীত কেটে গেল। মার্চ মাসটিও পেরিয়ে গেল। শুরু হল বৃষ্টি।

অনেকেই বলেন, সিলেট বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। এখানকার বৃষ্টি বড়ই বিশ্রী। শুরু হলে যেন থামে না। ঝম, ঝম, ঝম টিনের চালে পাকা ছাদের উপর পড়ে বৃষ্টি। কখনো আস্তে আস্তে, কখনো মুষল ধারে।

দেখতে দেখতে খোয়াই নদীতে বান ডাকল। নদীর পানি উপচে পড়ে দু' একদিনের মধ্যে আজমিরিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, বানিয়াচং ও লাখাই উপজেলার বিস্তীর্ণ হাওর এলাকা ডুবে গেল অতল গর্বে। হাজার হাজার একর ফসল ডুবে গেল মুহূর্তে। হতভাগ্য কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসল। এমনি করে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে চাষীরা বঞ্চিত হলেন তাদের ঘামঝরা পরিশ্রমের ফসল হতে।

খরা, বন্যা ও শিলাবৃষ্টি হবিগঞ্জ এলাকায় চাষীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কারণে যদি ঐ সমস্ত বিপদ হতে কৃষক রক্ষা পান তাহলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটে উঠে গোলা ভরা ধান পেয়ে। কারণ এ এলাকার মাটি খুবই উর্বর। অতি অল্প আয়াসেই প্রচুর ফসল উৎপাদন করতে পারেন কৃষক।

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, জেলা প্রশাসক, ও জনাব প্রণবেশ চন্দ্র মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) উভয়েই আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। জনাব আব্দুল করিম, ম্যাজিস্ট্রেট (শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা), বাবু শ্রীদাম চন্দ্র দাশ, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জনাব আফিল উদ্দিন শিকদার, জেলা কো-অর্ডিনেটর (উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা), বৃন্দাবন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ, সরকারী বালক-বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দকে আমি অত্যন্ত হিতৈষী বন্ধুরূপে পেয়েছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার হবিগঞ্জ সদরের বাবু দিলীপ কুমার বণিক, বাহুবলের আব্দুল্লা হেল-শাকী, নবীগঞ্জের মোস্তফা কামাল এবং মাধবপুরের মাহফুজা খাতুন তাঁরা সবাই আমার স্নেহের পাত্র ছিলেন। চুনারুঘাট উপজেলার শিক্ষা অফিসার জনাব শফিউল আলম খাগড়াছড়ি জেলা হতে বদলী হয়ে আসেন এ সেদিন। জনাব মাহমুদুল হক মুরাদ, লাখাই, জনাব গকুল চন্দ্র দেবনাথ, বানিয়াচং ও জনাব মোঃ তছলিম হোসেন, আজমিরিগঞ্জ নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার। তাঁরা ছিলেন প্রাণোচ্ছল ও কাজে আগ্রহী। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের মধ্যে বাবু সমরেন্দ্র লাল রায়, চুনারুঘাট, জনাব মকসুদ আলী, বানিয়াচং, জনাব আব্দুল বারী, আর্জামরিগঞ্জ ও জনাব ফরিদ মিয়া, লাখাইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা অনেক সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

৭২১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি, বেসরকারী ও স্যাটেলাইট বিদ্যালয় সহ প্রায় ১০০০টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪ হাজারেরও অধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা কাজ করেন হবিগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে। লক্ষণীয় যে এ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণ প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর কাজে সচেতন ও দক্ষ। ইহার কারণ এলাকাবাসীর সচেতনতা ও সহযোগিতা। তাঁরা সকলেই যাঁর যাঁর সন্তানের লেখাপড়া ও এলাকার উন্নয়নে সচেতন হয়ে উঠেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ইউনিসেফ সাহায্য পুষ্ট "আইডিয়াল" নিভিড় জেলা পদ্ধতিতে সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্প সর্বক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যালয় কার্যকরী কমিটি সবাইকে নাড়া দিয়েছে। বার বার কর্মকর্তা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শিক্ষা ক্ষেত্রে এনেছে বিপ্লব। নবতর ধ্যান ধারনার মাধ্যমে পাঠ দান করায় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে। শ্রেণী সজ্জিত করণ ও লেসন প্ল্যানের দ্বারা পাঠদানে বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে। নিঃসন্দেহে ইহাকে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষান্নোয়ন প্রকল্প ধরা যেতে পারে। ইহার দ্বারা ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে এ জেলায়।

২০০১ইং সনে হবিগঞ্জ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে নিরক্ষর মুক্ত জেলা হিসাবে পরিগণিত হবে। এ জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ আন্দোলনকে সফল করার জন্য তৃণমূল পর্যায় হতে জেলা পর্যন্ত গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও গণশিক্ষা বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিপুল কর্মী বাহিনী এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসন পাশাপাশি কাজ করে চলছেন এ কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করার জন্য। ১৫ই মার্চ হয়ে গেল গ্র্যান্ড র‍্যালী। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হল ইহার কার্যক্রম।

হবিগঞ্জ জেলা সদর একটি জনাকীর্ন শহর। এ শহরে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বাস করেন। রাজনীতিবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, আইনজীবী, গায়ক ও ব্যবসায়ীদের বাসস্থান হবিগঞ্জ। বহমান খোয়াই নদী হবিগঞ্জবাসীর সুখ দুঃখের সাথী।

যোগাযোগের দিক দিয়ে হবিগঞ্জ সদর খুবই উন্নত। সিলেট-চট্রগ্রাম-ঢাকা ট্রেন রাত্র-দিন চলাচল করে শায়েস্তাগঞ্জ হয়ে। ঢাকা-সিলেট-চট্রগ্রাম সংযোগ সড়কে প্রবাহমান বাস কোস্টার যোগে যে কোন সময় যে কোন যায়গায় যাওয়া যায়। এমনকি হবিগঞ্জ-ঢাকা বিরতিহীন বাস সার্ভিসে সকালে ঢাকা গিয়ে এবং অফিসের কাজ ছেড়ে বিকালে ফিরে আসা যায়।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ধারে চুনারুঘাট একটি জনবহুল উপজেলা শহর। এখান হতে একটি রাস্তা গাজীপুর এবং অপর একটি সড়ক গাভীগাঁও হয়ে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে। এ রাস্তায় এখনো বিভিন্ন কাজে ঘোড়ার ব্যবহার দেখা যায়। হবিগঞ্জ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এ. উপজেলা চা বাগানের জন্য বিখ্যাত। এখানে রাস্তার ধারে দৌলত খাঁ, চাকলাপুঞ্জী, দেউন্দি, লালচান্দি চা বাগান দেখা যায় চা

বাগান পেরিয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট। ইহাও নানা মূল্যবান কাঠে ভরপুর। চুনারুঘাটের আঁকা বাঁকা সুন্দর পথটি বেয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। সারা বছরই মাঠ পরিপূর্ণ থাকে সোনালী ধানে। ধান ক্ষেতের বুক চিরে যেন রাস্তাটি এগিয়েছে সামনে। রাস্তার দু'ধারে সবুজ বৃক্ষ শ্রেণী। সড়ক পথটি বি-বাড়িয়া গিয়ে এগিয়েছে দু'শাখায় ঢাকা ও চট্রগ্রামে। প্রবাহমান যানবাহন দ্বারা কোলাহল মুখর মাধবপুর উপজেলা। শ্রী সৌভাগ্যের অধিকারী এ উপজেলার অধিকাংশ লোক সম্পদশালী ও সৌখিন। মাধবপুর উপজেলা সদর হতে দক্ষিণ পূর্বে একটি সরু সড়ক চলে গেছে চৌমুহনী, ধর্মঘর হয়ে ত্রিপুরা সীমান্ত পর্যন্ত। এ সকল এলাকার লোকজন শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর। কথা-বার্তায়ও খাস সিলেটিদের উচ্চারণ এখানে তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

হবিগঞ্জ হতে উত্তর পূর্বদিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে তা হল বাহুবল উপজেলার। কিংবদন্তীর বাহু-কা-বল, দু' পালোয়ানের শক্তি প্রদর্শনের উপর এ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে শুনা যায়। বাহুবল উপজেলার মীরপুর একটি উল্লেখযোগ্য বাজার ও ব্যবসা কেন্দ্র। ইহা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় যানবাহন ও লোকজনের কোলাহলে সবসময় মুখর থাকে। বাহুবল উপজেলার স্নানঘাট একটি ঐতিহাসিক স্থান এবং মীরপুরের চা বাগানও দর্শনীয় স্থান। মীরপুর হতে বাহুবল সদর মাত্র ৮ কিলোমিটার রাস্তা। বাহুবল সদর পেরিয়ে যে রাস্তাটি এগিয়েছে তা হল আউসকান্দি সড়ক। উহা নবীগঞ্জ-শেরপুর সড়কের সাথে যুক্ত হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে সুন্দর ধানক্ষেত, স্কুল, মাদ্রাসা এবং ধনাঢ্য লোকের দেওয়াল ঘেরা বাগানবাড়ী।

আউশকান্দি হয়ে উত্তর পশ্চিমে কিছুদূর এগিয়ে গেলে নবীগঞ্জ উপজেলা সদর। যে উপজেলার লোকসংখ্যা ৩ লাখেরও বেশী সে উপজেলা সদর একটি ছোটখাট শহরতুল্য দেখতে। লন্ডন প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা এ উপজেলায় সবচেয়ে বেশী বলে সবাই জানে। এ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা ইনাতগঞ্জেও পাকা দালান, পাকা সড়ক দেখা যায়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ এ উপজেলা। হবিগঞ্জ হতে সরাসরি সড়ক পথে নবীগঞ্জের দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার।

জেলা সদর হতে হাওর অভিমুখে একটি পাকা সড়ক বানিয়াচং পর্যন্ত গিয়েছে। বানিয়াচং হাওর বেষ্টিত উপজেলা। এ উপজেলাও বেশ সমৃদ্ধ। বিখ্যাত সাগরদিঘী বানিয়াচং উপজেলা সদরে অবস্থিত যা দেখার মত। ১$^{১}/_{২}$ কিলোমিটার

দৈর্ঘ্য এবং ১ কিলোমিটার প্রস্থ ইহার আয়তন। বানিয়াচংয়ের বিথঙ্গলের আখড়া আর একটি ঐতিহাসিক কীর্তি। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের একটি তীর্থস্থান। নিত্য নতুন পর্ব ও উৎসবে এবং কীর্তন গানে মুখর থাকে এ পবিত্র স্থান।

বানিয়াচং উপজেলা পেরিয়ে হাওর গামী সরু রাস্তা রয়েছে। বর্ষাকালে যন্ত্রচালিত যাত্রীবাহী নৌকা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে আজমিরিগঞ্জ উপজেলায় যাওয়ার জন্য। বদরপুর ও জলসুখা হাওরের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে সর্বক্ষণ কূলে। শুষ্ক মৌসুমে বানিয়াচং হতে আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত সড়ক পথে জীপ চলে।

আজমিরিগঞ্জ যাওয়ার পথে জলসুখা একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা হাওরের মাঝে একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। অবিভক্ত ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু নেতা জন্ম নিয়েছিলেন এ গ্রামে। রায়বাহাদুর সতীশ চন্দ্র রায় যিনি আসাম প্রদেশের প্রথম বাঙালী জন শিক্ষা পরিচালক, তিনি এ গ্রামেরই সন্তান ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষায় গ্রামটিকে এখনো আজমিরিগঞ্জ উপজেলায় অগ্রপথিক হিসাবে গন্য করা হয়। জলসুখা গ্রাম পেরিয়ে একটি বিশালাকার বটবৃক্ষ। বটবৃক্ষের নীচে একটি মন্দির। মন্দিরের পাশে নানান ভয়ঙ্কর মুর্তি। স্থানটির নাম কালভৈরব। ইহার পাশ দিয়ে যেতে শ্মশানের নীরবতায় গা ছম ছম করে উঠে।

আজমিরিগঞ্জ উপজেলার উত্তর পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা অবস্থিত। পূর্বে ইহার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কালনী নদী দিয়ে বড় বড় স্টীমার চলাচল করত। এখনো এ নদী হয়ে ভৈরব পর্যন্ত নানা যানবাহন চলে। হাওরের অথৈ জলরাশি আছড়ে পড়ে সর্বক্ষণ আজমিরিগঞ্জ উপজেলা সদরে।

বর্তমানে এ উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায়ও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে উপজেলা সদরে। তবে বানিয়াচং হাওরের মধ্য দিয়ে রাস্তা হলেও বর্ষাকালে তা জলমগ্ন হয়। তাই সারা বছরে বাস চলাচলোপযোগী রাস্তা নির্মাণ করতে হলে এখনো অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাতে অর্থেরও প্রচুর প্রয়োজন হবে।

আজমিরিগঞ্জ উপজেলার লোকজন বেশ সুখ-শান্তিতে বসবাস করেন। আগের দিনে দরীদ্র লোকের খড়ের ছাউনী-ঘর এখন আর চোখে পড়ে না। সব গৃহই টিনের ছাউনী এবং গ্রামে গ্রামে বহু পাকা দালানও লক্ষ্য করা যায়। বর্ষাকালে নৌকা বাইচ, মাছ ধরা ইত্যাদি আনন্দজনক খেলাধূলা ও পেশা এ এলাকার লোকজনকে মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ।

লাখাই উপজেলা সদর হবিগঞ্জ জেলা শহর হতে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে কালাউক নামক স্থানে উপজেলা সদরের বিভিন্ন কার্যালয়-স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলা হলেও রাস্তাঘাটের তেমন উন্নয়ন হয় নাই। বর্ষাকালে সরাসরি সড়ক পথের কোন সংযোগ নাই। বুল্লা বাজার পর্যন্ত জীপ গাড়ী। সেখান হতে যন্ত্র চালিত নৌকায় যাতায়ত করতে হয় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে। কালাউকের পশ্চিম প্রান্তে মেঘনা নদীর পাড়ে পুরাতন লাখাই বাজার ও উপজেলা সদর অবস্থিত।

লাখাই উপজেলা যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখনো পশ্চাৎপদ। প্রত্যন্ত কামালপুর হাওর এলাকায় অনুন্নত একটি গ্রাম। ঐ সমস্ত এলাকায় এখনো শিক্ষার প্রসার হয়নি, বিদ্যুৎ সংযোগও হয়নি।

হবিগঞ্জ এলাকার লোকজন ধর্মভীরু। ধর্মীয় আচার অনুশীলনেও তাঁরা তৎপর। এখানকার লোকজন অনেকে পীর আউলিয়ার উত্তরসুরী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। শাহ্জী বাজার সংলগ্ন ফতেহ্ গাজীর (রঃ) মাজার বিখ্যাত। প্রতি বছর ভক্তরা জাঁকজমকের সাথে ওরস সম্পন্ন করেন এ মাজারে। সিপাহ শালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন (রঃ) এঁর মাজার অবস্থিত চুনারুঘাট উপজেলায়।

মহরম উপলক্ষে বিশাল বিশাল শোভাযাত্রা হয় তাজিয়া নিয়ে। ঢোল, করতাল, কিরিছ নিয়ে দস্তুরমত যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে একের পর এক মিছিল চোখে পড়ার মত।

অনুরূপ ভাবে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজায় হিন্দু ভক্তদের শোভাযাত্রা সারা শহরকে কাঁপিয়ে তোলে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হবিগঞ্জ বেশ অগ্রসর। হাজার হাজার প্রবাসীর প্রেরিত অর্থে হবিগঞ্জবাসী সমৃদ্ধিশালী। তাছাড়া চুনারুঘাট, বাহুবলের চা বাগান এবং বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে অনুকুল প্রভাব রাখছে। নব আবিস্কৃত বিবিয়ানা এবং শাহ্জী বাজার গ্যাস ক্ষেত্র দেশের অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। সাইহাম ইন্ডাস্ট্রি হবিগঞ্জের বিখ্যাত শিল্প কারখানা।

এক কথায় হবিগঞ্জে সব কিছুই আছে। এখানকার হাওর বিলের মাছ, গরুর দুগ্ধ, মাঠের ফসল, নিত্য প্রয়োজনীয় পানীয় চা দেশজোড়া খ্যাত। এখানকার উন্নয়নও বেশ চোখে পড়ার মত, জন প্রতিনিধিগণের জনকল্যানমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও এ এলাকার উন্নয়নের তৎপরতা প্রশংসনীয়। নতুন নতুন ব্রীজ, নব নির্মিত স্কুল, কলেজ ভবনের উদ্বোধন জনসাধারনকে কাজে উৎসাহ যোগায়। শায়েস্তাগঞ্জ হতে

হবিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ চালুকরণ এবং বানিয়াচং হতে আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারমান রাস্তা অত্র এলাকার অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

হবিগঞ্জের অধিবাসীরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাচ্ছেন উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর। এখানকার ফুলে ফুলে ছাওয়া বাগান, মিল-কারখানার চিমনীর ধোঁয়া, মাঠের সোনালী ফসল, হাওর বিলের মাছ, দুপুরের সোনা ঝরা রোদ এবং লোকজনের মধুর ব্যবহার আমার অনুভূতিতে চমক লাগিয়েছে।

এ এলাকার বাগানবাড়ীর রাতজাগা পেঁচকগুলি ঘুম পাড়ানীর গান গায়। শহর থেকে দূরে যাঁরা নিজেকে নিয়ে একটু ভাবেন মনের অনুভূতিতে অনুভব করেন তাহলে সৃষ্টিকর্তার অনেক কিছু লক্ষ্য করার মত জিনিষ আছে এখানে।

১৫ই মার্চ
২০০১ইং,
হবিগঞ্জ।

----------o----------

লালন মাস্টার

বাবু লালন মুৎসুদ্দি কেংড়া ছড়ি এল.পি. স্কুলের শিক্ষক। মাথায় টাক, গায়ের রং কালো, ক্লান্ত ভ্রু, তার নীচে বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ আপন কোটরে জ্বল জ্বল করে জ্বলে। ধব ধবে সাদা শার্ট, মার্কিন কাপড়ে সেলাই করা লুঙ্গি পরে তিনি নিয়মিত ভাবে স্কুলে আসেন।

স্কুলের পার্শ্বেই তাঁর বাসা। তিনি স্ত্রী পরিবার পরিজন নিয়ে থাকেন। বাল্য শিক্ষার মলাটে ছাপানো আদর্শ শিক্ষকের মত লাগে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়ালে।

রানখিয়াং নদীর ধারে বিদ্যালয়টি এ এলাকার শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। স্বচ্ছতোয়া রানখিয়াং নদী ঋতু পর্যায়ে পরিবর্তন হতো। বর্ষায় কুল ছাপানো বন্যা দেখা দিত এর আশপাশ এলাকায় আর গ্রীষ্মে হতো ক্ষীণ কায়া। এ

নদী দিয়ে কত নৌকা, কত লোক , রানখিয়াং রিজার্ভ ফরেস্টের কত কাঠ, বাঁশ ভেসে গেল। প্রকৃতির বুকে কত বসন্ত এল গেল, লালন মাস্টার তার খবর রাখেন না। স্কুল আর বাসা। এ ছিল তাঁর নিত্য দিনের কর্মসূচী। শিক্ষা কর্মকর্তার তদারকীতে নয়, গ্রাম বাসীর দুর্নামের জন্য কিংবা চাকুরী যাওয়ার ভয়েও নয়। তিনি কাজ করেন আত্ম নিবেদিত হয়ে। তিনি শুধু পড়াতেই ভাল বাসেন । সপ্তাহের ছুটির দিনটি ছিল তাঁর জন্য বিরক্তি কর।

ভর দূপুরে রানখিয়াং নদী যখন শান্ত ভাবে বয়ে যায়, নদীর পাড়ে রাখাল বালকেরা যখন গরু গুলো ছেড়ে আপন মনে খেলে, স্কুলের সামনে কামরাঙ্গা গাছটার ঝোপে যথন ঘুঘু পাখিটা একমনে ঘু ঘু রবে ডাকে তখনই লালন মাস্টারের জলদগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'পড়, 'স্বরে অ', 'স্বরে আ' ।

মাটির দেওয়ালে নির্মিত দু'কামরা বিশিষ্ট বিদ্যালয়টি দক্ষিণ মুখী। সামনে বাঁশের ঘেরা। এ ঘেরায় নানা জাতের ফুলের বাগান। বাগানে কত ফুল! লালন মাস্টারের ভয়ে কেউ ফুল ছিঁড়ে না। এমন কি গরু ছাগলের উপদ্রব থেকেও রক্ষার জন্য তিনি সদা সতর্ক থাকেন।

'বাল্য শিক্ষা'র শেষ পাতায় 'মা ও ছেলে' গল্পটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকবে তাঁর উপর। তিনি বলতেন, 'বিদ্যালয় ধর্মীয় স্থানের মত পবিত্র'।

কাঠের খড়ম পায়ে তিনি টুস ঠাস শব্দে হাঁটেন। ছাত্র-ছাত্রী পড়াতেন তিনি কোমল মন নিয়ে। উপজাতীয় ছেলে-মেয়ে সাধারণত জড়তায় ভোগে, তিনি তাদের উচ্চারণ শিখাতেন, তাদের মুখ খোলার চেষ্টা করতেন, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।

গ্রামের লোক তাঁকে সমীহ করে চলে। তিনি তখন দু' প্রজন্মের শিক্ষক। কোন ছাত্র দু'দিনের বেশী স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে গ্রামের কর্দমাক্ত রাস্তা পেরিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন অভিভাবকের বাড়ীতে। উঠানে দাঁড়িয়ে তিনি গম্ভীর স্বরে নাম ধরে ডাকেন, জনার্দন, 'তোমার ছেলে স্কুলে গেল না কেন'? পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে অনেক বেশী বয়সে স্কুলে যায়। তা ছাড়া এ পাহাড়, সে পাহাড় ও দূরের পাহাড়ে তারা বাস করে। এ সময়ে গরুর রাখাল জমি ও জুম ক্ষেতে বাবা মায়ের সাহায্য করে এবং ছোট শিশুদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে তারা ব্যস্ত থাকে। বাইরের মুক্ত পরিবেশে থাকা কতই না আনন্দের। বিদ্যালয়ে লালন মাস্টারের কান মলা খাওয়া, পড়া মুখস্ত বলা, শব্দ বানান করা কতই না বিরক্তিকর! তাই অনেকেই ধরা দিতে চায় না মাস্টারের হাতে।

লালন বাবু তাদের বুঝান, শিক্ষার গুণ সম্পর্কে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেন। একটা প্রতিকুল পরিবেশে পরিচালনা করতে হয় স্কুলটি। কৃষকের ঘরে ধান উঠলে কিছু দিন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অভাবের দিন এলে আবার তাদের সংখ্যা কমতে থাকে।

স্কুলে একট নড়বড়ে টেবিল, জোড়া তালি দেওয়া একটি চেয়ার আছে। এ চেয়ারে বসলে চেয়ারটি যেন আহা উঁহু করে উঠে। দেওয়াল ঘেঁষে গাছের পাত দিয়ে তৈরী নীচু বেঞ্চে বসে ছেলে-মেয়েরা পা দুলিয়ে দুলিয়ে পাঠ মুখস্ত করে। তাদের কলরব বৈশাখের নতুন পানিতে ভর্তি বিল ঝিলে বেঙের ডাকের মত শুনায়।

বয়সের ভারে জর্জরিত মাস্টার মশাই চেয়ারে বসে বসে ঝিমান। তিনি ছাত্রদের পড়তে দিয়ে কোন দিন কোথাও যান না এবং কাজে ফাঁকি দেন না। বরং মাঝে মাঝে শুধরিয়ে দেন। শ্লেটের লেখার উপর মুক্তার মত সুন্দর হস্তাক্ষর লিখে দেন।

মাস্টার মশাই অবসর সময়ে তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় নানা ধরনের বৃক্ষ ও শাক সবজির চাষ করেন। তাঁর শাক সবজির ফলন সব সময়ে গ্রামের অন্যান্যের চেয়ে ভাল হতো। তাই কোন কিছুতে ভাল ফলন না হলে গ্রামের লোক বলত, 'লালন মাস্টারের ক্ষেত দেখে এসো'।

কোন ধরনের অসুবিধা, অসুখ, বিসুখ, চিকিৎসা, ধর্মীয় সংক্রান্ত পরামর্শ থাকলে লোকজন লালন মাস্টারের কাছে ছুটে যেত। তিনি তাদের সু পরামর্শ দিতেন। তাতে সবাই সন্তুষ্ট হতো।

একদিন জানা গেল মাস্টার মশাই সরস্বতী পূজা করবেন। দেবী সরস্বতীর প্রতি চাকমাদের বিশ্বাস থাকলেও তারা পূজা পার্বনাদি করে না। সে দিন দলবল সহ সবাই হাজির হল মাস্টার সাহেবের বাড়ীতে। মাস্টার মশাইয়ের গিন্নী ইতিমধ্যে খই, চিড়া, মুড়ি, ভাজিয়েছেন। নিজ বাগান হতে পাকা কলার ব্যবস্থা করেছেন। মুর্তি ও ব্রাহ্মণের মন্ত্র ছাড়া সরস্বতীর পূজা সারা হল সে দিন। সবাইকে বিতরণ করা হল প্রসাদ।

কচি মনে সরল বিশ্বাসে সরস্বতীর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরল সবাই সেদিন বাড়ীতে আনন্দে। এ ভাবে মাঝে মাঝে তিনি সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ করান।

কোন সময়ে অসুস্থতা বশতঃ তিনি বিদ্যালয়ে যেতে অপারগ হলে তাঁর বড় ছেলেকে পাঠাতেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি না হয়। তাঁর বড় ছেলে

আর্যমিত্র মুৎসুদ্দি পোলিও রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এক পা খোঁড়া। যে দিন তিনি আসতেন সে দিন ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দের সীমা থাকত না।

শক্ত কাঠের তৈরী বড় লাটিম ও ঘিলা খেলা চলত স্কুল প্রাঙ্গণে। কচি জাম্বুরা ফুটবল বানিয়ে খেলা হত দু'দলে সারা দিন। ত্রিশের দশকে আসা যুবক লালন মাস্টার একাধিক্রমে পঞ্চাশ দশকের শেষ নাগাদ শিক্ষকতা করে এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি যখন এ এলাকায় আসেন তখন শিক্ষার হার ছিল শূন্যের কোটায়। চাকমা ও মারমাদের মধ্যে শিক্ষার চর্চা ছিল নিজস্ব বর্ণমালায়। তাও ছিল সীমিত। কেবল ঝাড় ফুঁক মন্ত্র শিক্ষার জন্য। তাই লালন মাস্টার ছিলেন এ এলাকায় প্রথম বাংলা জানা শিক্ষক। সরকার হতে তিনি মাত্র মাসিক দশ টাকা হারে বেতন পেতেন বলে শুনা যায়।

১৯৬০ ইংরেজী কাপ্তাই বাঁধের কারণে লালন মাস্টারের পাঠশালাও একদিন জলমগ্ন হয়। বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় লালন মাস্টার অবসর নিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁর নিজ জন্মস্থান রাঙ্গুনিয়া থানার মুৎসুদ্দি পাড়ায়। হারিয়ে গেলেন তিনি জনারণ্যে।

কিন্তু সত্যই কি লালন মাস্টার হারিয়ে গেলেন? না, লালন মাস্টারেরা হারিয়ে যান না। তাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের কর্মের মাঝে। আজীবন কর্মকেই যে তিনি ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন।

----------o----------

তুইচুই হতে বেটলিং

২১ জানুয়ারী ১৯৭৭ ইংরেজী। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাজেক ভ্যালীর তুইচুই গ্রাম। শীতের সকাল। দূরের বনে বুনো হরিণে ডাক শুনা গেল। কাছের বনে নানা পাখির কিচির মিচির। সাড়ে চার হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত তুইচুই পাহাড়ের শীর্ষদেশ রোদে ঝলমল করে উঠল। নীচের পাহাড় গুলো এখনও ঘন কুয়াশায় আবৃত। মনে হলো মেরু দেশের ভাসমান জাহাজে বসে আছি।

কংলক গ্রাম হতে দীর্ঘ পাহাড়ী পথ হেঁটে তুইচুই পাড়ায় পৌঁছি সন্ধ্যায়। অপূর্ব সুন্দর গ্রামটি। এর পূর্ব পার্শ্বে প্রলম্বিত মিজোরামের সুউচ্চ পাহাড়ে মেঘের

রোদ্র-ছায়ার খেলা দেখা যায় এখান হতে। তুইচুই পাড়ার কার্বারী তাইচুঙ্গার লোকজন আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন নিজের উৎপাদিত চা পান করায়ে।

পাড়াটি লুসাই উপজাতী অধ্যুষিত। পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত। সবাই জুমিয়া এবং গরিব। বাঁশ পাতার ছাউনী যুক্ত ছোট ছোট মাচাং ঘর। ঘরের একটি মাত্র কামরায় রান্না-বান্না অতিথি আপ্যায়ন সব কিছুই হয়। সহজ সরল ধর্ম বিশ্বাসী উপজাতীগণ এ নিয়ে সন্তুষ্ট।

অতিথির আগমনে পাড়ার কার্বারী মিস্টার তাইচুঙ্গা লুসাই একটি শুকর বধ করে খাবারের আয়োজন করেছেন। বিকালে পাড়ার সব লোকজন ডেকে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা ও শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা শেষে অতিথির আগমন উপলক্ষে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ঢোল ও গিটার বাজিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাঁশ নৃত্য ও ধর্মীয় সঙ্গীতের আয়োজন করে।

রাত্রে লুসাই ছেলেরা টর্চ লাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন সংকেত পাঠাল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, আমরা আগামী কাল বেটলিং যাচ্ছি --। সে সংবাদটা তারা আলোর সংকেতের সাহায্যে পাঠিয়েছে। এ ভাবে তারা শুভা-শুভ বার্তা, ভয়, মৃত্যু সংবাদ এমন কি নির্বাচনের নির্ভুল ফলাফল এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে থাকে। দুর্গম অঞ্চলে এ যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্যি অভাবনীয়।

তুইচুই পাহাড় হতে বেটলিং পাহাড়ের দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। এখান হতে ভোরের কুয়াশা ভেদ করে দূরে তা ভাসমান জাহাজের মত দেখা যায়।

ভোর বেলা মিস্টার মাইকেল লুসাই আমাদেরকে নাস্তা খাওয়ার আহ্বান জানালেন। তিনি এ গ্রামের একজন প্রাথমিক শিক্ষক। বড়ই ভদ্র এবং অমায়িক লোক তিনি। সকালের নাস্তা বলতে তেমন কিছু না, সুঘ্রাণ যুক্ত বিন্নি চালের ভাত এবং লবণ চা।

সকাল বেলা নাস্তা খাওয়ার পর আমরা যাত্রা করলাম বেটলিং এর উদ্দেশ্যে। চীনের মহা প্রাচীরের মত পাহাড়ের শীর্ষ দিয়ে রাস্তাটি চলে গেছে বেটলিং, যুগপুই, তাংনাং ও পুকজি পাহাড় পর্যন্ত শত মাইল। পাহাড়ের শীর্ষ পথের বাম পার্শ্বে কাচলং রিজার্ভ ফরেস্ট এবং অপর পার্শ্বে বেটলিং মৌজা এলাকা। সাজেক এলাকায় লুসাই পাংখোরা আদি বাসী। এ এলাকার সাতটি মৌজা প্রধানই লুসাই বা পাংখো উপজাতীয়। পাহাড়ের শীর্ষে উটের কুজের মত স্থানে লুসাই ও পাংখোরা বাস করে। আর চাকমা ও ত্রিপুরারা বাস করে অধিকতর নিম্ন স্থানে যেখানে ঝর্ণা ও ছড়া থাকে।

বেটলিং মৌজার নিম্ন এলাকায় পূর্ণ কুমার, ফরেই সিং, গুলুং কার্বারী ও সাদা কার্বারী পাড়া চাকমা অধ্যুষিত এবং সুবি কুমার, মোহন, বিজয়, অনুধ্বজ, বলেন্দ্র, বাণী কুমার ও রেঙ্যাপাড়া ত্রিপুরা অধ্যুষিত। এ সমস্ত পাড়া খুবই দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত এবং সেখানে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলতে চলতে পৃথিবীর আদি কালের কথা মনে পড়ে। আদি কালে পৃথিবী ছিল জঙ্গলময়। এ এলাকা শত শত বছর ধরে রিজার্ভ ফরেস্ট হওয়ায় এখানকার প্রকৃতিতে আদিমতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আদি কালের মত অনেক জায়গায় গজে উঠেছে বিশাল বিশাল বাঁশের গোছা -- বিভিন্ন জাতের, নানা আকারের। শত বছরেও তাদের কেউ ব্যবহার করতে আসে নাই। তাই এ গুলি আপনা-আপনি বুড়িয়ে মারা গেছে এবং আবার নতুন গজিয়েছে। অনুরূপ ভাবে মরিচা ও গোলা বেত বিশাল অজগরের মত পেঁচিয়ে আকাশ ছোঁয়া গাছের উপর উঠে গেছে আবার অনেকে বুড়িয়ে মারা গেছে। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যকার বিশাল বিশাল বৃক্ষ।

এ গভীর অরণ্য পথে চলার সময় মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতে হয় ব্যাঘ্র ভল্লুকের ডাক শুনে বা হাতির বৃংহতি রবে। সন্তর্পণে এগুতে হয় হিংস্র জন্তু ও সাপের ভয় এড়াতে। বনের ধারে কোথাও শত বছরের পরিত্যক্ত বসতি দেখা যায়।

কোথাও দেখা যায়, পুরাতন কমলা লেবুর গাছ। পরিত্যক্ত কমলা গাছে আপনিই ফুল ফোটে, ফল হয় এবং পেকে ঝরে যায়। কমলার প্রতি এলাকা বাসীর কারও লোভ নেই। কারণ তাদের প্রত্যেকের ঘরে কমলার গাছ আছে।

এক জায়গায় দেখা গেল, বহু পাখি খুঁত খুঁত শব্দে উড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, এ সময়ে এ পাহাড়ে পাখিরা জংলী ধান খেতে আসে। সঙ্গীটি গোছা গোছা জংলী ধানের খড় এবং ধান দেখালো আমাকে।

আবার কিছু দূর এগুতে দেখা গেল এক বিশালাকার মাঠ যা ছয় ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট দেওয়াল দ্বারা ঘেরা। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এর নাম 'লুংথিয়াং'। লুসাই ভাষায় লুং অর্থ পাথর এবং খিয়াং অর্থ উপরে সাজানো। অর্থাৎ পাথরের উপর পাথর সাজানো মাঠ। এক একটা পাথর আয়তাকার ও বর্গাকার বিশিষ্ট এবং এত ভারী যে, এক একটা পাথর দু'জন লোক দ্বারা উঠানো সম্ভব নয়।

এ পুরা কীর্তির ইতিহাস হলো খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে লুসাই ও পাংখো উপজাতী ছিল জড় উপাসক। এ সময় তারা নানা শক্তির উপাসনা করত। আনুমানিক দু'শত বৎসর পূর্বে এ জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবান্ন উৎসব। এ স্থানে

গরু, গয়াল, হাতি বলী দেওয়া হয়েছিল। সাত দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ উৎসব।

এ উৎসবে জংলী রাজা নাচ, গান ও মদ্য পানে মত্ত হয়ে নেচেছিল, গেয়েছিল সবে। কালের সাক্ষী হয়ে আছে এখনও দেওয়াল ঘেরা এ পাথর গুলো।

এভাবে পাহাড়ের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে লোকালয়হীন নিঃসঙ্গ রাস্তাটি ফুরিয়ে এলো টের পেলাম না। সম্বিৎ ফিরে পেলাম গ্রাম্য মোরগের ডাক শুনে। দেখলাম, সামনে বিশাল পাহাড়ী গ্রাম। শতাধিক পরিবারের লোক বাস করে এ গ্রামে। গতকালের আলোর সংকেতে জানতে পেরেছে আমাদের আগমনী বার্তা। তাই পাড়ার কার্বারী, তাঁর লোকজন ও ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষক জনাব চাল থাঙ্গা পাংখো আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

চারিদিক ঘুরে ফিরে আমরা বেটলিং গ্রামটি দেখলাম। পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর গ্রাম। ছোট বড় সারিবদ্ধ কমলার গাছগুলো শীতের হিমেল হাওয়ায় মৃদু দুলছিল। গ্রামের ছাত্র-ছাত্রী ও লোকজন সরলতার হাসি হেসে আমাদের কাছে তাদের পরিচয় দিল। গ্রামের কার্বারী সাংলুয়ানা পাংখো আমাদেরকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন।

অতিথি আপ্যায়নের জন্য এখানে কোন চায়ের দোকান নেই। কমলার মৌসুমে কমলা বা অন্য সময়ে লবণ চা ছাড়া আপ্যায়নের জন্য কিছু নেই। তাই কার্বারী যথোপযুক্ত ভাবে অতিথি আপ্যায়নের অপারগতা জানিয়ে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করছেন: মুখে তার সরলতার হাসি।

তবে তিনি দুপুরের খাবারের নিমন্ত্রণ জানালেন আমাদের। আমরা তাঁকে বারবার বারণ করা সত্বেও পাহাড়ী সরলতা তাঁর চোখে মুখে ঝরে পড়ল। ঘরের মাচার উপর রাখা দো'নলা বন্দুকটি টেনে নিয়ে তিনি তর তর করে নেমে গেলেন মোরগ শিকারের জন্য।

কিছুক্ষণ পর ঘরের আঙ্গিনায় চরে বেড়ানো তাঁর সবচেয়ে বড় মোরগটি বন্দুকের গুলিতে শিকার করে বাড়ি নিয়ে আসলেন। তাঁর সরলতা দেখে আমারা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলাম।

তিনি বন্দুকটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আমাদের আবার বললেন, 'আজ আমার বাড়িতে খেয়ে যেতে হবে'।

----------o----------

নুন ছড়ি পুকুর

নুনছড়ি পুকুর কোন মানব সৃষ্ট পুকুর নয়। সৃষ্টির আদিতে কোন এক সময়ে কি হয়েছে তা কেউ জানে না। কিন্তু এখানে ঘটেছে এক বিচিত্র সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা আপন মহিমায় সৃষ্টি করেছেন এখানে এক গভীর খাদ সৌন্দর্যে যা চট্রগ্রামের বিখ্যাত 'ফয়েজ লেকের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এলাকাবাসী এর নাম দিয়েছে নুনছড়ি পুকুর।

সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ১০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যেমন্ডিত এটি একটি মনোরম স্থান। তিন দিক হতে অতি বৃহৎ পাহাড় ক্রমশঃ ঢালু হয়ে এসে মিলিত হয়েছে এখানে। মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি জলাশয়, আকারে যা একটি ছোট খাট নদীর সমান। আনুমানিক ১০ একর পরিমাণ হবে এ জলাশয়। কাক চক্ষু সম ইহা সুগভীর স্ফটিকের মত ইহার স্বচ্ছজল। ইহার মধ্যখানে গভীরতার সুস্পষ্ট চিহ্ন। ইহার ছোট ছোট ঢেউ খেলানো জল পবিত্রতার আধার।

শান্ত পুকুরের আশপাশ এলাকা জনমানব বসতিহীন। নির্জনতায় গভীর অরণ্য এখনো ঝাঁ ঝাঁ করছে। পুকুরের ধারে বৃহৎ শিলাখন্ডের উপরে বসে সৃষ্টিকর্তার মহিমা চিন্তা করা যায়, উপলব্ধি করা যায় সৃষ্টিকে। একটি পবিত্র মন নিয়ে এখানে আসতে হয়। উর্দ্ধলোকে সাদা মেঘের ভেলা, নিম্নে সবুজে ঘেরা নিথর পাহাড় শ্রেণী আর পুকুরের স্বচ্ছ শান্ত জলরাশী এসব মিলে এ স্থানের প্রকৃতির এমন এক ধ্যান গম্ভীর রূপ সৃষ্টি করে যে মনে হয় কোন তপস্বী অনন্তকাল ধরে এ স্থানে সৃষ্টিকর্তার আরাধনায়রত রয়েছেন বা কোন দেবী তাঁর নিথর কাল চুল এলিয়ে সাদা শাড়ী পরে ভক্তজনের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করছেন।

কিংবদন্তীর এ পুকুরের কত উপ-কথা সরল পাহাড়ীমনে দাগ কেটেছে যা এখনো তাদের মুখে মুখে শুনা যায়। কথিত আছে এ পুকুরের দেব দেবীরা এক সময় মানুষের প্রতি ছিল খুবই সদয়। কোন লোক অতিসরল প্রাণে যদি দেবীর সাহায্য কামনা করে মানত করে তাহলে দেবী তার মনস্কামনা পূরণ করে থাকেন। যেমন বিবাহ বা অন্য কোন উপলক্ষে ভক্ত যদি থালাবাসন টাকা পয়সা ইত্যাদি চেয়ে মানত করে তাহলে সেগুলো পরদিন সকালে পুকুরের পাড়ে আপনি পাওয়া যেত। এ পুকুরের গভীরতা কত তা এখনো মেপে দেখার কেউ সাহস করেনি। বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায় ব্রিটিশ আমলে কোন এক সার্ভেয়ার দল কিনা এর গভীরতা

মাপতে ব্যর্থ হয়েছে এবং পরবর্তীতে নাকি তাঁরা নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এখনো এ বিশ্বাস এলাকাবাসীর মনে ঘুরে ফিরে আছে যে এ পুকুরের দেব দেবীর সাথে কোন ধরনের ঠাট্টা তামাশা করা যাবে না। পুকুরের জল কেউ নোংরা করতে পারবে না। এর আশপাশের এলাকায় কেউ পায়খানা প্রস্রাবাদি করতে পারবেনা। পুকুরের আরও একটা বৈশিষ্ট যে এতে কোন শেওলা নেই। এর পাড় সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এতে কোন বৃক্ষের পাতা ভাসমান অবস্থায় থাকে না। প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট অরক্ষিত এ পুকুরের সুন্দর পরিবেশ ভাবতে অবাক লাগে।

দর্শনার্থী চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, হিন্দু, মুসলিম সবাই যার যার ধর্মানুসারে এ স্থানের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন। বিশেষ করে উপজাতীয়রা এ স্থানে দেবীর নামে নানা কিছু মানত করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এ এলাকায় মেলা বসে। উপজাতি সম্প্রদায় এ পুকুরের পানি পবিত্র মনে করে বোতলে ভর্তি করে বাড়ী নিয়ে আসে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাইচছড়ি বাজারের পশ্চিমের সুউচ্চ পাহাড়ে ইহার অবস্থান। খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কের পাশে মাইচছড়ি বাজার যা খাগড়াছড়ি সদর হতে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। সেখান হতে পায়েচলা রাস্তায় ৩ কিলোমিটার দূরে থলিপাড়া ত্রিপুরা পাড়া। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ইহা একটি অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ী গ্রাম। নুনছড়ি ছড়াটি কলকল রবে হাজার হাজার ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখন্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এ গ্রামের পাশ দিয়ে। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি কাঠের পুল পেরিয়ে পাহাড়ী দীর্ঘ পথ যা পেরুতে আপনাকে এনে দিবে

ক্লান্তি। পাহাড়ের শীর্ষে উঠে বিশালাকার বটগাছের ছায়ার দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখা কাঙ্খিত পুকুরের দৃশ্য দেখে এবং এক ঝলক পাহাড়ী বুনো হাওয়া ক্লান্তি দূর করে আপনাকে এনে দিবে স্বস্তি।

ত্রিপুরা অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এ পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব ভার তাদেরই। এ নিয়ে তাদের গৌরব। একে ঘিরে তাদের সংস্কৃতি উপ-কথা এখনো ঘুরে ফিরে বলে যাচ্ছে চুপে চুপে কানে কানে আবহমানকাল ধরে।

----------০----------

খাগড়াছড়ির আকর্ষণ আলুটিলার সুড়ঙ্গ

প্রকৃতির বুকে লালিত পাহাড়ি কন্যার মত খাগড়াছড়ি বয়সে এখনো কিশোরী। ইহার ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক কালের। মাত্র ১৯৮২ইং সনে খাগড়াছড়ি নতুন জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাই সে এখনো অঙ্গ সৌষ্ঠবে ও মননে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি, প্রস্ফুটিত হতে পারেনি পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যে। একটি পূর্ণাঙ্গ ও আকর্ষণীয় শহর হিসাবে গড়ে উঠতে ইহার এখনো ঢের বাকী। এখানে চিত্ত বিনোদন মূলক কোন পার্ক বা জলাশয় নেই। নেই কোন শিল্প কারখানা, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; ইহাতে নেই আকর্ষণীয় হোটেল, পর্যটনের পিকনিক স্পট এবং কেনা কাটার উপযুক্ত বিপনী বিতান।

মফঃস্বল এ শহরের বাসিন্দাদের এখনো শহুরে রূপ ধরেনি। তাঁদের অনেকের স্বভাবে কেমন যেন গ্রামীণ গ্রামীণ ভাব। অনেক উপজাতীয় লোক দারিদ্র্য ক্লিষ্ট। জীর্ণবস্ত্র পরিধান করেই তারা খাগড়াছড়ি বাজারে আসেন।

একটা সীমিত পরিসর নিয়ে খাগড়াছড়ি শহরের অবস্থান। উত্তরে স্বনির্ভর বাজার, স্টেডিয়াম, জেলা পরিষদ অফিস ভবন, দক্ষিণে পানখাইয়া পাড়া মারমা সম্প্রদায়ের পল্লী এলাকা, পূর্বে খাগড়াপুর ত্রিপুরা পাড়া, পশ্চিমে বাস টার্মিনাল এবং মাঝখানে খাগড়াছড়ি বাজার, কোর্ট রোড এবং জেলা প্রশাসন ভবন, সরকারী স্কুল কলেজ। এইতো খাগড়াছড়ি। ইহার লোকসংখ্যা আনুমানিক ২০ হাজার।

খাগড়াছড়ির পশ্চিম পার্শ্বে ক্ষীণকায় চেঙ্গী নদী ধীরলয়ে প্রবাহিত হয় শুষ্ক মৌসুমে, আবার বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে উঠে। ভেসে নিয়ে আসে পাহাড়ের খড়কুটা, পরিত্যক্ত কাঠ ও বাঁশের টুকরা।

৮টি উপজেলার নাভি কেন্দ্র খাগড়াছড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল। সকল উপজেলার সাথে সড়ক পথে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। টেলিফোন ব্যবস্থায়ও সকল উপজেলার সাথে যোগাযোগ ভাল। পশ্চাৎপদ পার্বত্য জেলা হিসাবে কয় বছর আগেও এ সহজ যোগাযোগের ব্যবস্থা চিন্তা করা যেত না। এখন খাগড়াছড়ি হতে দিঘীনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মানিকছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা পর্যন্ত পীচ ঢালা পথ হয়েছে। এমন কি উপজেলা সদর পেরিয়ে কোন কোন যায়গায় গ্রামাঞ্চলেও সম্প্রসারিত হয়েছে বিদ্যুৎ ও পাকা রাস্তা। এ এলাকার সম্প্রসারমান রাস্তা, বাস, কোস্টার ও পরিবহণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ্য

করার মত। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাথে সরাসরি রাস্তা সংযোগ হওয়ায় ইহার উন্নয়নের নবদ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এবং ইহাতে কাচালং রিজার্ভ ফরেস্টের অফুরন্ত বনজ সম্পদ আহরণেও এখন বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

জনবহুল বাঘাইছড়ি উপজেলার লোকজন এখন খাগড়াছড়ি জেলার মধ্য দিয়ে জেলা শহর রাঙ্গামাটির সাথে যোগাযোগে অভ্যস্ত।

খাগড়াছড়ি বাজার, বাস টার্মিনাল ও চেঙ্গী স্কোয়ার আন্তঃউপজেলা ও আন্তঃজেলা পরিবহণ ব্যবস্থার লোকজনের হাঁক ডাঁক গাড়ীর হর্ণ ও রিক্সার টুং টাং শব্দে মুখর থাকে সবসময়।

খাগড়াছড়ি শহর হতে আন্তঃজেলা সংযোগ রাস্তাটি যা চট্টগ্রাম ও রামগড় হয়ে ফেনীর সঙ্গে সংযুক্ত তা চেঙ্গী নদীর ছোট ব্রীজটি পার হয়ে পাহাড় অভিমুখে চলে গেছে। বাসযোগে পাহাড়ের আঁকা বাঁকা এ পথটি বেয়ে যাওয়ার সময় দু'পাশে চোখে পড়ে ছোট ছোট কুঞ্জবন। কোথাও জুম ক্ষেত। দু'পাশে কাশবন যা শারদীয় উত্তরীয় হাওয়ায় মাথা দোলায়। টিপ, টিপ ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরা জলে পাহাড়ের গায়ে ঝরণার উৎপত্তিস্থল দেখে ক্রমে ঘুরে ঘুরে রাস্তাটি অনেক উপরে উঠে গেছে যেন মেঘের কোলে। বর্ষায় মেঘের হালকা আস্তরণ কুয়াশার মত ঢেকে ফেলে পাহাড়ের চূড়া ও রাস্তা। এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর! বড়ই চমৎকার! এ পাহাড়টিই আলুটিলা নামে পরিচিত।

খাগড়াছড়ির সমতল এলাকা হতে আলুটিলার পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে যেন কষ্টে গাড়িটি সপ্তম ধাপে খেদাছড়া আর্মি জোন কর্তৃক নির্মিত বিশ্রামাগারের পাশে উঠে আসবে। তারপর সেই স্থান হতে আরও তিন ধাপ এগিয়ে গেলে দেখা যাবে আলুটিলা পর্যটন এলাকার সাইনবোর্ড। পর্যটন এলাকায় দু'টি বিশাল বটগাছ যা সারা বছর সুশীতল ছায়া দান করে। তার নীচে আছে বিশ্রামাগার ও ছোট ছোট দোকান।

"আগে নয়ন হেরি, তারপর গুণ বিচারী"। সত্যিই নয়নাভিরাম এ স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য। পূর্বদিকে তাকালে দেখা যায় নীচে খাগড়াছড়ি শহরটি যেন পটে আঁকা ছবি। ইহার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট পাহাড়ী নদী চেঙ্গী যেন ইহার গলার মালা হিসাবে শোভা পায়।

পর্যটন এলাকায় প্রবেশের গেইট পাস ২ টাকা মাত্র। ইহার পূর্বপার্শ্বের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় ১৫০০ ফুট পাহাড়ের শীর্ষদেশ হতে ক্রমে

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে হবে নীচে আলুটিলার সুড়ঙ্গ দেখতে। এখানে প্রকৃতির একটি নীরব ভাষা আপনাকে শুনাবে নানান কথা। দু'পাশের বনে পাতার মর্মর ধ্বনি, জংলী কলা পাতার মৃদু মন্দ হিল্লোল আপনাকে জানাবে সাদর সম্ভাষণ। পাহাড়ের নাম না জানা পাখীর কূজন এবং পোকা মাকড়ের একটানা সঙ্গীত আপনাকে মুগ্ধ করবে।

নীচে পাহাড়ের মধ্যভাগে সিঁড়িটি পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেমে গেছে নিম্নের পাহাড়ী ছড়া পর্যন্ত। কান পেতে শুনুন, ঝম - ঝম - ঝম। কেমন, নূপুরের শব্দ, না ? কথা বলুন প্রতিধ্বনি হবে। একটি বিশাল গহ্বর নিম্নাভিমুখী হয়ে চলে গেছে। ঝরণার পানি গলধঃকরণ করছে সে, বড়ই তৃষ্ণার্থ যেন। উচ্চতায় ১০ ফুট, প্রস্থে ৬ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ১২৫ ফিট হবে সুড়ঙ্গটি। ইহার ভিতর গভীর অন্ধকার যেন বাসা বেঁধেছে চিরকাল। সংস্কারাচ্ছন্ন পাহাড়ী লোক; কেউই সাহস করতনা এ গহ্বরে ঢুকার। একবার ঢুকে যদি বের হয়ে আসতে না পারে; এ ভয়ে। যুগ যুগ ধরে উপজাতীয় লোকের কৌতুহলের স্থান হয়েছিল এ গহ্বর। উপরের পাহাড় ভাঙ্গা অংশের সুড়ঙ্গে না ঢুকে পাহাড়ে উঠে এসে আবার নীচের দিকে মূল পথে অগ্রসর হউন। জেলা পরিষদ, পার্বত্য খাগড়াছড়ি কর্তৃক নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামুন। একা একা নামবেন না। স্থানটি বেশ নির্জন। নীরব অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করছে চারিদিক। সঙ্গী সাথী নিয়ে নামবেন। তাহলে পাহাড় উঠা নামায় রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

সিঁড়িটি ঠিক নীচে নেমে গেছে একেবারে ঝরণা পর্যন্ত। দেখবেন ঝরণার পানি কেমন ছমছম শব্দে নেমে আসছে। শির শিরে ঠান্ডা হাওয়ায় গায়ে শিহরণ লাগবে। আনন্দে কাঁটা দিয়ে উঠবে সারা শরীর।

নীচের ধাপে সুড়ঙ্গটি এখানে এসে শেষ হয়েছে। ঝরণার পানি বেরিয়ে আসছে এখানে সারাটি বছর ধরে। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ, শিলাময়। উপরের শিলা হতেও ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে পানি এখানে।

ডাক দিয়ে ফিরুন। হে অন্ধকার, আলোর দিকে আস। তোমার রূপ দেখি। বোবা প্রকৃতি, আপনার কথা শুনবে না। শুধু প্রতিধ্বনি হবে অরণ্যে, শিলাময় পাহাড়ে ও এ বিশাল সুড়ঙ্গে।

কে জানে কবে মানুষের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য, অজানাকে জানার জন্য কোন এক সাহসী লোক গহ্বরে ঢুকে মানুষের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছিল প্রথম। জয় করেছিল নিচ্ছিদ্র অন্ধকারকে আলোর মশাল দিয়ে। কই, নেই তো সে দেবতা

এখন, যে এতদিন মানুষের মনে বাসা বেঁধে-ছিল? পর্যটকগণ এখন আলোর মশাল নিয়ে সুড়ঙ্গের নীচ হতে উপরে উঠে আসেন বীরদর্পে।

নারী পুরুষের সমবেত কণ্ঠস্বরে মুখরিত থাকে আলুটিলার চূড়া। পাহাড়ের ঝরণাটি কিন্তু সারা বছরই জেগে থাকে পাহাড়ে। তাইতো এত উচ্চতায়ও চিন্তা করতে হয় না পাহাড়ীদের পানীয় জলের।

পাহাড়ের ধাপে দু'দিকের সুড়ঙ্গ দেখে ও পাহাড় উঠা নামায় হাঁপিয়ে উঠেন অনেকেই। পাহাড়ের ধাপে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত গোলঘর, যেখানে বসে পর্যটকরা বিশ্রাম নিতে পারেন। অবলোকন করতে পারেন চারিদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্য।

পাহাড়ের এ নির্জন স্থানে প্রায় সময় লোকজনের আগমন ঘটে। গ্রীষ্মের সময় ছায়া সুশীতল বটবৃক্ষের নীচে পাহাড়ী হাওয়ার মৃদু হিল্লোলে শরীর জুড়িয়ে যায়।

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে প্রবাহমান বাস লরীর যাত্রীরা তাকান পর্যটন কেন্দ্রের এ সুন্দর স্থানের দিকে। তাঁরা দেখেন পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণে কাসলং ঈনের প্রলম্বিত পাহাড়ের সারি। দূরে দূরে পাহাড়ীয়ার জুম ক্ষেত, পাহাড়ের বুকে যেন বিছানো চাটাই। কোথাও দেখা যায় উটের কুজের মত পাহাড়ের চূড়া ও সারিবদ্ধ বৃক্ষ শ্রেণী যেন মরু ভূমির উটের বহর ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে মরূদ্যানের দিকে।

উন্মুক্ত আকাশ তলে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী দেখে কার না মন উদাস হয়? সত্যিই মনোমুগ্ধকর খাগড়াছড়ির এ নৈসর্গিক দৃশ্য। এ এলাকায় এলে আলুটিলার এ আজব সুড়ঙ্গ, দেবতার পুকুর এবং ধোপানী ঘাট দেখার কার না সাধ জাগে ?

----------o----------

থানচীর পথে

১৯৭৯ ইংরেজীর সেপ্টেম্বর মাস।

রুমা থানার থানা শিক্ষা অফিসার হিসাবে বদলী হই সে বছর।

রুমার আয়তন তখন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থানচী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। থানচী তখনও আলাদা থানা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। রুমা ও থানচী

এলাকার ৯৫% ভূমিরূপ সুউচ্চ পাহাড় ও নীচু টিলা শ্রেণীভুক্ত। রুমার যে কোন পাহাড়ের চূড়া হতে দৃষ্টি মেলে তাকালে দেখা যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ছোট বড় অসংখ্য টিলা ও দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। দেখা যায় ছোট বড় অনেক বৃক্ষ ও লতা গুল্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত বিরান ভূমি। এবং বহুদূরে দেখা যায় রেমাগ্রী ও বগা মঈনের পাহাড় শ্রেণী যেন মেঘের সাথে কোলাকুলি করছে।

এখানকার একস্থান হতে অন্যস্থানে যোগাযোগের মাধ্যম হল একমাত্র পায়ে চলার রাস্তা। বর্ষার দিনে বান্দরবান হতে রুমা পর্যন্ত সাংগু নদীতে ছোট ছোট যন্ত্রচালিত নৌকা চলে। রুমা হতে থানচী পর্যন্ত উজান পথে যেতে নৌকায় লাগে দু'দিন।

আর নৌকা পথে না গিয়ে হাঁটা রাস্তায় গেলেও দু'দিনের প্রয়োজন। রুমা হতে বলী পাড়া পর্যন্ত দূরত্ব পাহাড়ী রাস্তায় ৩২ মাইল। যাওয়ার পথে প্রথমে রুমা বাজার হতে বগামুখ ৮ মাইল এবং বগামুখ পাড়া হতে মোংগ কার্বারী পাড়া ১০ মাইল। এ পথটিও দুর্গম। উঁচু নীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে রুমা খালের উজান পথ দিয়ে যেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ পথে চলার সময় রুমা খালের নুড়ী পাথর পায়ে বিদ্ধ করে, খালের পিছল শিলা পার হতে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। মাঝখানে শত টন ওজনের শিলা খালের মুখ আগলে থাকে। শিলার উপর ছোট ছোট সিঁড়ির মত পা ফেলার জন্য খাঁজ কাটা আছে, সাবধান না হলে পা পিছলে রুমা খালে ঝপাস করে পড়ে ভেসে যেতে হবে।

রুমা থানা কমপ্লেক্সের পিছনে সুউচ্চ টিলায় ভোরে বন মোরগটি ডেকে উঠে। হেমন্তের শিশির ভেজা ঝোপঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলি একটানা ডেকে উঠে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ। পাহাড়ের চূড়ায় কুয়াশার আস্তরণ, ভোরে হিমেল হাওয়া বহে। তখন প্রকৃতিকে কেমন যেন ঝিমধরা নীরস মনে হয়। এ সময় বর্ষার বৃষ্টিও থেমে যায়। কোন কোন সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও তাতে ঋতুর কোন প্রভাব পড়ে না। সাংগু নদী ধীরলয়ে প্রবাহিত হয় এ সময়। পাহাড়ের ঝরণা ও ছোট ছোট ছড়াগুলি বর্ষার ছন্দ হারিয়ে যেন বিশ্রাম নেওয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন।

প্রকৃতি যখন ছন্দ হারিয়ে অন্য তালে সুর বাজায়, তখনি এ এলাকার জনপদে একটা আনন্দ ধ্বনি এবং এক সুখ প্রবাহ প্রবাহিত হয়। এ সময় ঘরে ঘরে জুমের ধান উঠে আসে। ধান তোলার পর তিল (ঘস্যা) কার্পাস তুলা উঠানো হয়। ঘস্যার বনে ভ্রমরের ভোঁ ভোঁ গুঞ্জন ধ্বনি শুনা যায় একটানা। মাঝে মাঝে জুম ক্ষেতের ধারে ঝোপ ঝাড়ে, কাঁশবনে এক ঝলক বুনো হাওয়া এসে ঢেউ খেলে

যায়। কার্পাস তুলার খোসাগুলো তখন পাকাপোক্ত হয়ে উঠে, দু' একটা সাদা সাদা তুলাও ফুটে উঠে।

এমন সময়ে একদিন ভোর বেলা বান্দারাম ত্রিপুরা ও দুর্গামনি ত্রিপুরাসহ আমরা থানচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম পাহাড়ী রাস্তা ধরে। উদ্দেশ্য পাহাড়ী জনপদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করা। আমরা প্রথমে রুমা খালের দিকে যাত্রা শুরু করি। তারপর বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে রুমা খালে এসে পড়ি। রুমা খালের এপাড় ওপাড় দিয়েই রাস্তাটি এগিয়ে চলেছে সামনে। বগামুখ পাড়া যেতে রাস্তা, ইহাই সহজ। অন্য বিকল্প পথ হিসাবে পাহাড়ীরা যে পথ ব্যবহার করে তা সকল লোকের পক্ষে চলাচল উপযোগী নহে। কারণ এ পথ এতই বন্ধুর যে তা অতিক্রম করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি সময়েরও প্রয়োজন। তাই আমরা খালের পথ বেয়েই যাওয়া মনস্থ করি। এ পথে বহু নুড়ী পাথর পেরিয়ে, পিছল শিলা পার হয়ে, বালুচর পাশ কাটিয়ে উপজাতীয় গ্রামের পাশ দিয়ে অবশেষে বগামুখ পাড়ায় এসে পৌঁছি। তখন আমার অবস্থা হয়েছিল শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন।

বগামুখ পাড়ায় বট গাছ ও তেঁতুল তলায় বিশ্রাম নিতে খুবই আরাম। মারমাদের দু'তিনটি দোকান আছে এখানে। পাহাড়ী খাবার ভাত ও তরকারী পাওয়া যায় দোকানে। ধেনো মদেরও ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ী লোকজন পথ ক্লান্ত হয়ে অনেকে দোকানের মদ পান করে চাঙ্গা হয়ে উঠে।

এপাড়ার পাশ দিয়ে রুমাছড়া কল কল রবে সহস্র শিলা গড়িয়ে প্রবাহিত হয়। এ স্থানে রুমা, বগাছড়ি, পানছড়ি ও ক্রখ্যাংছড়ি এ ৪টি ছড়া মিলিত হয়ে চৌমোহনী সৃষ্টি করেছে। এখানে চারিদিকের ৭টি পাহাড়ের শিরা উপশিরা মিলিত হয়ে প্রকৃতির বুকে এমন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সৃষ্টি করেছে যে, যা দেখার মত, উপলব্ধি করার মত। পাহাড়ের প্রশস্ত এ উপত্যকায় সব সময় ঝরণার মুখর ধ্বনি শুনা যায়। একটা ঠান্ডা বায়ু প্রবাহ সব সময় ঘুরে ফিরে এখানে অবস্থান করে বিধায় এখানকার আবহাওয়ায় যেন চির বসন্ত বিরাজ করে। এ স্থানে রাস্তা বিভক্ত হয়েছে বিভিন্ন দিকে। একটা

রাস্তা চলে গেছে দুর্গম রেমাগ্রী হয়ে আরাকান অঞ্চলে, অন্য একটি রাস্তা গেছে পিয়ং ফিডং পাড়া পার হয়ে মিজোরাম সীমান্ত পর্যন্ত। তৃতীয় পথটি বগাছড়ি হয়ে বলি পাড়া ও থানচী পর্যন্ত। চারিদিকের নিঝুম অরণ্য এবং ছড়া ছড়ির কলরব বগামুখ পাড়া পাহাড়ী গ্রাম দূর দূরান্ত থেকে আগত পথ যাত্রীদের আকর্ষণ করে। তাই এ স্থানটি তারা বেছে নেয় বিশ্রামের ও রাত্রি যাপনের।

দেখা গেল, এখানে একদল মুরং পথযাত্রী এক জায়গায় রান্না চড়িয়ে দিয়েছেন তেঁতুল গাছ তলায়। তাঁরা মেয়ে পুরুষ সবাই এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছেন। তাঁদের পোশাক বিচিত্র, মেয়েরা আঁট সাঁট কাপড় পরা, পুরুষেরা অনেকে কেবল নেংটি। মুরং মেয়েরা বাজারে যাওয়ার সময় আঁট সাঁট কাপড়ের সাথে এক টুকরা মার্কিন কাপড় বগলের নীচে এবং অপর অংশ কাঁধে পেঁচিয়ে পরেন। মুখ উসকো, খুসকো, তৈল হীন চুল, রুক্ষ। পিছনের কাপড়ের পুঁটলিতে ছোট শিশুদের তাঁরা ঝুলিয়ে রাখেন। গলায় পুঁতির মালা, কানে রূপার বড় চোং, যার ভরে কান দুটি সামনে ঝুলে থাকে। তাঁদের ভাষায় তাঁরা কি কথা বলাবলি করেন কেহই তা বুঝেন না।

শীতের রাতে আগুনের কুন্ডলী ঘিরে তাঁরা রাত কাটায় খোলা আকাশের নীচে। অনেক সময় রাতে কিংবা ভোর রাতেও তাঁরা পথ চলেন। পিঠে তাঁদের ভারী বোঝা থাকে। তাঁদের ঝুড়িতে থাকে চাল, কার্পাস তুলা, জুমে উৎপাদিত নানা ধরনের মূল্যবান আলু, কচু ইত্যাদি।

দেখা যায় রুমা বাজারের বেপারীরাও দীর্ঘ পথ হেঁটে এখানে এসে মালামাল ক্রয় করে কিছু টাকা অগ্রীম দিয়ে রাখেন এবং পরদিন তাদের দিয়েই মালামাল রুমা বাজার পর্যন্ত পৌঁছান।

অনেক সহজ সরল পাহাড়ী বাজারে মালামালের দর দাম বুঝেন না। তাঁরা বেপারীদের খপ্পরে পড়ে তাঁদের জিনিষ পত্রের অর্ধেক দাম পান না বলে তাঁরা জানায়। বাজারের যাত্রী হিসাবে চাক্‌মা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, পাংখো, খুমী ও তঞ্চঙ্গ্যারাও এখানে এসে রাত্রি যাপন করেন।

উপজতীয়দের উদাম শরীর। মশামাছি যেন কামড় বসাতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষায় বালাই নাই। প্রত্যেকে তাঁরা যাঁর যাঁর সামাজিক নিয়ম কানুনে চলেন।

বিভিন্ন ছড়া মিলিত হয়ে যেমন মোহনা সৃষ্টি করে ঠিক তদ্রুপ বিভিন্ন উপজাতিও এখানে মিলিত হয়ে মানুষের মিলন মেলা সৃষ্টি করেছে।

বগা পাড়ার পার্শ্বেই বগামুখ ছড়া। বগাহ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এ ছড়া। বান্দরবান জেলার বগা হ্রদের নাম কে না শুনেছেন? যুগ যুগ ধরে পর্যটনের আকর্ষণ এ বগা হ্রদ। এ হ্রদকে ঘিরে উপজাতীয়দের মধ্যে নানা রূপকথা ও উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস এ হ্রদের কোন তলদেশ নেই, পাতাল পুরী পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। দেবতারা এখানে মনের সুখে জলকেলী করে। এ স্থানে এলে

হিংস্র প্রাণী বাঘ, ভালুক পর্যন্ত শান্ত হয়ে যায়। যে হ্রদের পানিতে কোন বস্তুই ভাসমান থাকে না, তাই সে হ্রদের পানি পবিত্র বলে এলাকাবাসী মনে করে।

বগাহ্রদকে ঘিরে উপজাতীদের মনে এমন একটি উপকথা প্রচলিত আছে যে, কোন এক সময় একটি বড় গর্তে একটি সাপ বর্শি দ্বারা গেঁথেছিল এক লোক। এ সাপের মাংস ভক্ষণ না করার জন্য এক ধার্মিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্বপ্ন দেখেছিলেন যা তাঁরা পাড়ার সকলকে বলেছিলেনও। কিন্তু তাঁদের কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই এবং পাড়া গ্রামও ছেড়ে যায় নাই। ফলস্বরূপ নাগ রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন রাতে পাড়াশুদ্ধ লোকজনকে টেনে নিয়েছিল নরকে। কিংবদন্তীর এই কথা ভেবে অনেকেই এখনো পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে। প্রায় এক হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত চারিদিকের উচুঁ পাহাড়ের শিরা মিলিত হয়ে উপত্যকা সৃষ্টি করে এ হ্রদ উৎপন্ন হয়েছে। চারদিক শান্ত সমাহিত নিঝুম বনবেস্টিত নৈসর্গিক সৌন্দর্য মন্ডিত এ হ্রদ এখনো আপন বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান। বগা হ্রদের পাশ দিয়ে পথ চলতে চলতে দেখা যায় নীচু পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে পানি উঠছে। সম্ভবত হ্রদের পানির সাথে সংযোগ থাকায় এরূপ হচ্ছে।

এখানকার বন উপবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাতাসের শন শন শব্দের মধ্যে যেন মুরংদের বাঁশীর শব্দ শুনা যায় হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ..... হুঁ হুঁ। এবং মাঝে মাঝে সমস্বরে হৈ-হুল্লোড় 'রেইং'। এই এলাকায় হল মুরংদের আদি বাসস্থান। তাঁরা উৎসব করেন পাড়ায় গরুবলী দিয়ে। এ উৎসব নবান্নের; নতুন শস্য তোলার উৎসব।

বগাহ্রদের পাশ দিয়ে পাহাড়ের নীচে ছড়ার মধ্যে দিয়ে চলার সরু রাস্তা। মাঝে মাঝে অতি সংকীর্ণ গিরিখাদ যা খুব সাবধানে পার হতে হয়। এবং কোথাও বাঁশের ছোট সাঁকো তৈরী করা হয়েছে। গ্রামের কোন লোক হয়তোবা একান্ত ধর্মীয় মন নিয়ে সাঁকো দেওয়ার কাজটি করেছেন। চলার পথে একটি টিলা পার হতেই নীচে সিছাই মুরং পাড়া। ছোট ছোট ঘর। সেগুলো বাঁশ পাতা ও শনের ছাউনী যুক্ত। বিশাল শব্দে কামব্লাই ছড়া ইহার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শিলার উপর গড়িয়ে যাওয়ায় জল স্রোতের একটানা কল কল শব্দ। গ্রামের নীচ দিয়ে আবার ছড়ার পথ বেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সামনে। একটি টিলা পার হয়ে আর একটি টিলায় উঠলাম। কামব্লাই ছড়ার ঝম ঝম আওয়াজ ক্রমে ছোট হয়ে আসে। আমরা একটা উপত্যকা পার হয়ে আর একটি উপত্যকায় এসে গেলাম। আবার সেই জনহীন প্রান্তর।

কোন কোন স্থানে ছড়ার ধারে দু' পাহাড়ের মাঝে সংকীর্ণ ঝিড়ি। এ স্থানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা শিলা কুড়িয়ে তার মাঝে জমি জমার চাষ করা হচ্ছে। এ জমির ফসলও নিরুপদ্রব নহে। ক্ষেতের উপর চারিদিক পাহাড় পর্বতের নানা জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে বনের শুকর এবং পাকা ধানের উপর তোতা ও পায়রার উপদ্রবে পাহাড়ীরা অতীষ্ট হয়ে উঠে।

খুবই সংকীর্ণ ছড়ার পথ বেয়ে যেতে হঠাৎ সামনে পড়ে একেবারেই উদাম শরীরে কেবল মাত্র নেংটি পরা অবস্থায় উপজাতীয় লোক। তাদের হাতে থাকে একেবারে ছিম ছিমে ধামা দাও, পাশ দিয়ে যেতে শরীর ভয়ে রি রি করে উঠে। না জানি কোন কোপ দিয়ে বসে কিনা। কিন্তু তা নহে, স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় তারা পাড়া গ্রাম থেকে এসেছে শাক-সবজি খোঁজার জন্য। চাটাই ঝুড়ি ইত্যাদি বানানোর জন্য, মুলি বাঁশের ডগা সংগ্রহ করার জন্য এবং সোনাই ছড়ায় কাঁকড়া ও মাছ ধরার জন্য। বনের ভিতর বাঁশের কচি ডগা বাচ্ছুরী বা বাঁশ কোঁড়া খোঁজার জন্যও তারা আসে।

কোন কোন স্থানে মুরং যুবক একা মনে লাউয়ের তৈরী বাঁশী বাজিয়ে চলে। মনে হয়, যেন কোন সাপুড়িয়া বাঁশী বাজাচ্ছে। পথচারীরা পাশ কেটে যাওয়ার সময় তারা হেসে হেসে চলে যায়। তাদের গাও উদাম ও সোনালীবরণ। এ জঙ্গলে যেন পোশাক পরিচ্ছদের বাহুল্য নাই। বনের গাছ-গাছালী ও নির্জনতা যেন শরীরের আবরণ হিসাবে তাদের লজ্জা নিবারণ করে।

সারাদিন পথ ক্লান্তিতে শরীর একদম মুছড়ে পড়েছে। পা গুলো যেন আর এগুতে চায় না সামনে। রুমা হতে বহু পথ ভেঙ্গে এবার আমরা একটি বিশাল আকার পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছলাম। এ পাহাড় বেয়ে পথটি উঠে গেছে যেন মেঘের কিনারা, স্বর্গের সিঁড়ি পর্যন্ত। পথচারী সঙ্গীরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না, এ পাহাড়ের উপরেই মঙ্গো কার্বারী পাড়া। মঙ্গো কার্বারী একজন ত্রিপুরা উপজাতীয় লোক।

তাদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমি আবার উপরে উঠতেই থাকলাম। পাহাড়টি যেন উঠা শেষ হয় না। আস্তে আস্তে বিশ্রাম নিয়েই আমি আবার জোর পদ বিক্ষেপেই চলি। এমনি করে অতি ক্লান্ত শরীরে একটা পাহাড় উঠা শেষ করলাম। পাহাড়ে উঠার পর কিছুটা এগিয়ে যেতেই গ্রাম্য কুকুরের ডাক শুনা গেল।

পাহাড়ের ধাপে দু'টি পাড়া মঙ্গো কার্বারী পাড়া ও গুলিরাম পাড়া। মাঝ খানে একটি ঝরণা দু' পাড়াকে বিভক্ত করেছে। আমরা মঙ্গো কার্বারী পাড়া পেরিয়ে

গুলিরাম কার্বারী পাড়ায় গেলাম। তখন বিকাল ৪টা। মঙ্গো কার্বারী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হালিরাম ত্রিপুরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। গায়ের ব্যথা কমানোর জন্য গরম জলেরও ব্যবস্থা করলেন।

এ দু'টি পাড়া পাহাড়ের অনেক উপরে অবস্থিত। শীত কালে ভোর হতে না হতেই সোনালী রোদ পড়ে গ্রামের উপর। নীচে থাকে কুয়াশার আস্তরণ।

বর্ষাকালে আবার এ পাহাড় ঘিরে থাকে মেঘ পুঞ্জ। ঘন কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা থাকে এখানকার গ্রাম গুলো। খুবই স্বাস্থ্য-কর এখানকার আবহাওয়া।

ছোট ছোট ঘরে সংসার পেতেছে অনেক পাহাড়ী। সে ঘরে শিশুর কান্না, মায়ের আদর আছে, কিশোরের চপলতা, বালিকার মধুর হাসি, যুবক যুবতীর ভবিষ্যৎ জীবনের মধুর স্বপ্ন এ সবই আছে। পাড়ার গরু, শুকর, ছাগল, মোরগ-মুরগী সবই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ের ধারে ও মাচাং ঘরের নীচে। দেখা গেল যে, মাস্টার বাড়ীর খোলা মাচাং ঘর বা ইজরের উপরও এক সময় ঘুরে বেড়ানো মোরগটা পাখা ঝাপটিয়ে ডেকে উঠল ককরে ..... কক শব্দে।

হালিরাম বাবু আমাদের আপ্যায়ন করার জন্য কাজে লেগে গেলেন। চা, চিনি, বিস্কিট আমাদের সঙ্গেই ছিল। কারণ এখানে এ গুলোর ব্যবস্থা নেই। রান্নার কাজে সুবিধার জন্য সঙ্গে খাবার তৈল, মশলাও ছিল। এখানে আপ্যায়নের জন্য আছে কলা, পেঁপেঁ ইত্যাদি। বিন্নিভাত সবায়ের ঘরে আছে। তাই অতিথিদের জন্য সাধারণতঃ ইহাই পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

আমাদের বসার জন্য মাচাং ঘরের একপাশে পাটি, তার উপর গিলাপ কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা বিছানার উপর বসে হালিরাম বাবুর পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা শুনছিলাম। তার স্ত্রী প্রথমে আমাদের জন্য বিন্নি চালের ভাত রাঁধলেন। দু' কামরা বিশিষ্ট ঘর। সবই লক্ষ্য করা যায় একস্থানে বসে। বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্কুল ইনসপেক্টর এসেছেন শুনে অনেক লোক দেখা করার জন্য আসছেন। হালিরাম বাবুর গৃহটি খুবই ছোট, তা আবার শুধু বাঁশের খুঁটির উপর তৈরী করা হয়েছে। তাই একটু নাড়া চাড়া করতেই গৃহটি দুলে উঠে। এত হালকা এবং মশকরা ভাবে ঘর তৈরী করেছেন কেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে উত্তর দিলেন আমরা এ রূপই ঘর তৈরী করে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিন্নিভাত রাঁধা হয়ে গেলে তার স্ত্রী আমাদের ভাত বেড়ে দিলেন। হালিরাম বাবু একটা বাসনের মধ্যে চিনি রেখে আমাদের তা পরিবেশন

করলেন। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাঁর পরিবেশিত খাবার আমরা গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম।

এরপর আবার রাতের রান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে। হালিরাম বাবুর মাচাং ঘরের নীচে খাবার দিয়ে ফাঁদ পেতে ইতিমধ্যে একটি বড় মোরগ ধরা হয়েছে বিকালে ভোজের জন্য। গ্রামের সহজ সরল লোক। আতিথেয়তায় সুযোগ পেলে আপ্রাণ চেষ্টা করেন অতিথির মন সন্তুষ্টির। যত বেশী প্রকার তরকারীর আয়োজন করতে পারেন ততই তাঁদের আনন্দ। মুরগীর মাংস, নানান শাক-সবজী। যারা মদ পান করে তাদের জন্য মদ পরিবেশন করা হয়।

এখানে রাত শুরু হয় যেন অনেক আগেই। কারণ সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমের আয়োজন হয় ঘরে ঘরে। ছোট খুপী জ্বালিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? তাই রাত বেড়ে যেতেই শিশুর কোলাহল প্রথমে থেমে যায়। পাহাড়ী এলাকায় ধান ভানার ঢেঁকির শব্দ থেমে আসে। সব স্তব্ধ হয়ে গেলে ক্রমে ঝরণার কলরব স্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন একলা রাতে দূরে বহুদূরে পাহাড়ের ঢালে পতিত চাঁদের আলোটাকে কেমন যেন ম্লান দেখায়। বনের ঝোপ ঝাঁড়ে আবার পেঁচকগুলো ডেকে উঠে মোক-পো-কদরক, মোক-পো-কদরক শব্দে।

সেদিন হালিরাম ত্রিপুরার বাড়ীতে রাতের নেমন্ত্রণ খেলেন গ্রামের গুলিরাম কার্বারী এবং অনেকে। সুখ-দুঃখের নানা গল্প তাদের মুখে মুখে শুনা গেল। একদিন যে সময় এখানে পূর্ব পুরুষেরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন তখন ছিল শুধু একটি মাত্র চিন্তা। বৎসরের জুম ক্ষেতে ধান পাওয়া। এ সময় পাহাড় এত উর্বর ছিল যে, অল্পায়াসে তাঁরা প্রচুর ধান উৎপাদন করতে পারতেন। পাহাড়ে জুম ক্ষেতের ধান কেউ চুরি করত না। তাই জুম ক্ষেতের টংঘরে খড়সহ ধান তুলে রাখতেন। প্রয়োজন হলে সেখান হতে কিছু কিছু ধান মূল গ্রামে নিয়ে আসতেন। জুম ক্ষেতে উৎপন্ন হত প্রচুর মারফা, চিনার, আলূ, কচু, আদা ইত্যাদি। তাঁরা তা খেয়ে ফুরাতে পারতেন না। ক্ষেতের ফসল ভাল হলে তাঁরা কিনতেন রূপার নোলক, কানের বড় চোংওয়ালা কানফুল, হাতে বাজুবন্ধ ও গলায় হাঁসুলী। পায়ে ৪০ তোলার রূপার খাড়ু যা চলার সময় টুং ঠাং শব্দ হতো। নব বধূকে তাঁরা সাজাতেন তাঁদের মনের মত।

জঙ্গলে ছিল নানা ধরনের পশু, শুকর, হরিণ, বন মোরগ এবং নানা ধরনের পাখী, যে কোন সময় ইচ্ছা করলেই গ্রামের গাদা বন্দুকটা দিয়ে শিকার করে আনা যেত।

তখন ছোট ছোট ছড়াতে ও নানা ধরনের মাছ, কাঁকড়া যেন কিল বিল করত। ইচ্ছা মতো মালিকানা বিহীন ছড়া হতে প্রয়োজনীয় মাছ, কাঁকড়া ধরে আনা যেত। জঙ্গল হতে আনা যেত প্রয়োজনীয় বাঁশ, বাঁশকোঁড়া, নানা ধরনের শাক-সবজী এবং কোগুলা, ম্রে-আম, এবং কুসুম গুলো নামক মিষ্টি ফল। কি সুখের দিন না ছিল সে সময়! লেখাপড়া কিংবা লেখাপড়ার খরচ নিয়ে তাদের চিন্তাই করতে হত না।

বৃদ্ধ কৃষ্ণ নাথ কথাগুলো বলতে বলতে যেন আফসোস করতে থাকেন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর জন্য। তাঁর চোখে ফুটে উঠে বিষাদের ছায়া। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে থাকেন, এখন পাহাড় বিরান হয়েছে, যে দিকে তাকানো যায় শুধু শূন্যভূমি। ইহাতে আর ভাল ফসল হয় না। তা ছাড়া লোকজন বেড়ে গেছে অনেক। বেড়ে গেছে মানুষের জীবন ও জীবিকার চাহিদা। এখন আর অভাব মোটেই যায় না।

রুমা থানার বলী পাড়া এলাকার ত্রিপুরারা অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। ধর্ম প্রচারকদের ধর্ম প্রচারণা ও সরকারী সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যেও শিক্ষার আলো প্রসারিত হতে শুরু করেছে। এ ভাবে গল্পের মাধ্যমে রাত্রি ৯টা বেজে গেলে পাড়ার মেয়েরা যারা এতক্ষণ চরকায় সূতা কাটছিল তারা এখন দীর্ঘ হায় তুলে শুতে গেল।

গুলিরাম ত্রিপুরা তাঁর বাড়ীতে রাত্রে শোয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ তাঁর বাড়ীটা একটু বড় ধরনের। হালিরাম ত্রিপুরার মাচাং ঘরে এতক্ষণ গল্প হচ্ছিল। এখন গুলিরাম বললেন, "আপনার অনেক পরিশ্রম হয়েছে আজ। চলেন, **"ঘুমুতে যাই"**। আমরা তাঁর বাড়ি হতে বের হয়ে গ্রামের উচুঁ নীচু জায়গা পেরিয়ে গুলিরাম ত্রিপুরার বাড়ীতে গেলাম। খুব সাবধানে পা ফেলতে হল। কারণ গরু, ছাগল, শুকরগুলো এমনি খোলামেলা ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে গুলো রাস্তার বিভিন্ন স্থানে শুয়ে, দাঁড়িয়ে আছে।

গুলিরাম ত্রিপুরার বাড়ীতে উঠে পা ধুইয়ে নিলাম। তিনি মিটমিটে খুপী বাতিটা জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিলেন আমার বিছানাটা। বাঁশের মাচার উপর সবাই শুইয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে মাথায় কি একটা কঠিন বস্তু ঠেকল। হাতে স্পর্শ করে দেখলাম মাথায় কোন বালিশ দেওয়া হয় নাই। দেওয়া হয়েছে বড় একটি লম্বা বাঁশ। অনুরূপ ভাবে শীত নিবারণের জন্য দেওয়া হয়েছে গিলাপ কাপড়।

ক্লান্তি নেমে এসেছে চোখে ও মুখে। গুলিরাম আবার আগামী কাল তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছেন। পাহাড়ের ঝরণা এবং পেঁচকের গান শুনতে শুনতে কখন যে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পেলাম না।

আগামী দিন বিদ্যালয় পরিদর্শন ও অভিভাবক সমাবেশ হবে। এখানকার ত্রিপুরারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতি এখনো অটুট রয়েছে। তাঁদের নাম এখনো কৃষ্ণ, রাম, দশরথ ইত্যাদি।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের আগমন উপলক্ষে স্বাগতম গেইট তৈরী করা হয়েছে। বিদ্যালয় গৃহও সজ্জিত করা হয়েছে। রং বেরঙের গাঁদা ফুল দ্বারা মালা তৈরী করে ছাত্র/ছাত্রীরা গেইটে অপেক্ষমান। পরিদর্শন উপলক্ষে বিদ্যালয়ে আসার সাথে সাথে ছোট ছেলে-মেয়েরা কলরব করে উঠল, "স্কুল ইনসপেক্টর" এসেছেন স্বাগতম, "স্বাগতম" ইত্যাদি বলে আমাদের বরণ করে নিল।

সেদিন যথারীতি বিদ্যালয় পরিদর্শন ও লেখা পড়ার উন্নতি সম্বন্ধে এলাকার সকলের সাথে আলাপ আলোচনা হল।

পরিদর্শকের আগমন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হালিরাম বাবু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এ জন্য পার্শ্বের গীর্জা হতে আনা হয়েছে ঢোল, গিটার ও হারমোনিয়াম। অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী জগরাম ত্রিপুরার নাচ সবাইকে মুগ্ধ করেছে। মিনতি ও মালতি ত্রিপুরা কবিতা আবৃত্তি করেছে। বিষ্ণু ও হালিরাম বাবু রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেছেন। এ ভাবে অনুষ্ঠান শেষ হলো সুন্দর ভাবে।

সেদিন অতিথির আগমন উপলক্ষে গুলিরাম কার্বারী একটি শুকর বধ করে গ্রামের লোকজনকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন। অনেক আনন্দ উৎসবের মধ্যে গুলিরাম ও মোংগ পাড়ার অবস্থান শেষ হয়ে এল। তাঁদের সরলতায় ও আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হলাম।

মোংগ পাড়া হতে আমরা যাত্রা করব বলি পাড়ার উদ্দেশ্যে। পথে পড়বে আদিকা পাড়া, কালা পাড়া, ক্যাসো পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়। মোংগ পাড়া হতে আদিকা পাড়ার দূরত্ব ১০ মাইল। উহাও ত্রিপুরা অধ্যুষিত। বান্দারাম ত্রিপুরার বাড়ীও সে পাড়ায়। খ্রীষ্টান রীতি অনুযায়ী আমরা পরস্পরের সাথে হ্যান্ড স্যাক করে বিদায় নিলাম। মেয়ারাও হাসি-খুশীতে আমাদের বিদায় দিলেন।

ঃ সমাপ্ত ঃ